পাক্ষিক
আহমদী
নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা
১৫ই জানুয়ারী, ১৯৯৮

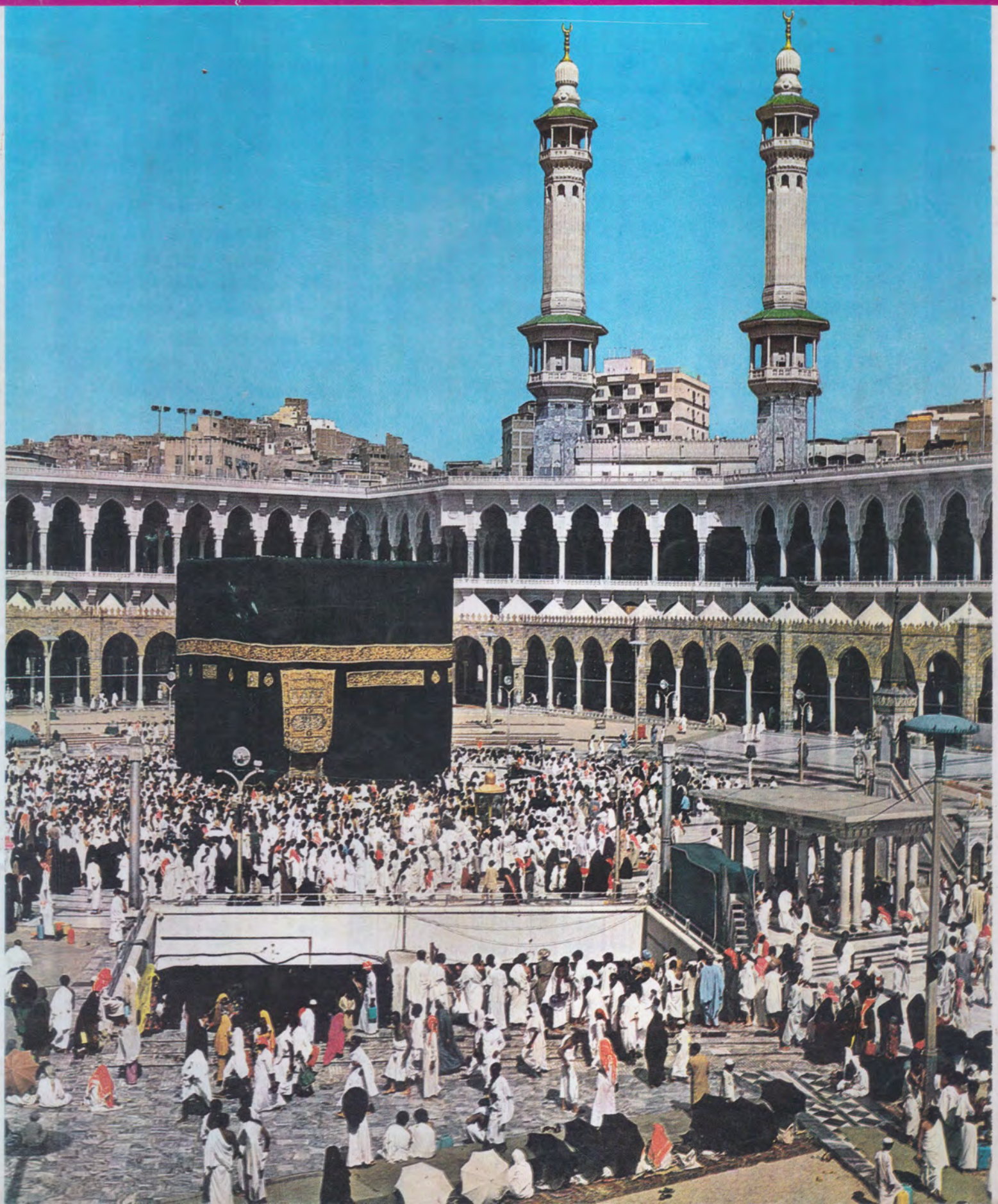

পাক্ষিক আহ্‌মদী নবসাজে সজ্জিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে
এই ঐতিহাসিক মুহূর্তে আমরা বিশেষভাবে দোয়াপ্রার্থী

* আল্‌হাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী
* মিসেস মরিয়ম খাতুন
* মাওলানা মাহমুদ আহমদ
* মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন
* মিসেস হোসনে আরা হোসেন
* এ. কে, রেজাউল করীম
* শামসুন্নাহার করীম
* ডাঃ আব্দুল আজিজ
* মিসেস আমেনা আজিজ
* মাওলানা বশীরুর রহমান
* সরকার সালুয়া সুলতানা মুরাদ
* আব্দুস সালাম * মিসেস মাদাহ্‌ সালাম
* নঈম তফভিয
* মাহবুব হোসেন * জেবীন হোসেন
* ফায়েজা হোসেন * আলেয়া রিফফাত
* মোহাম্মদ লোকমান হোসেন
* সেলিম আখতার ইসলাম
* মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান
* মোহাম্মদ মুতিউর রহমান
* সৈয়দ হাসান মাহমুদ
* আবু নাসের
* মুহাম্মদ শাহাবুদ্দীন
* মুহাম্মদ ফয়েজুল্লাহ্‌
* শামসুল হক * নূরুল হক
* নূরুদ্দীন খান
* বশীরুদ্দিন আফজালখান চৌধুরী
* মিসেস মাসুদা সামাদ
* ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান
* নূরজাহান আকবর (মরহুমা)
* আলহাজ্ব মোহাম্মদ আবুল কাশেম পাটওয়ারী
* মোহাম্মদ জাকারিয়া
* মিসেস আমাতুর রশিদ
* আলী নূর আহমদ (রাফি)
* মোবারেকা জাহান (বিন্দু)
* রাফিয়া মোবাশ্বেরা (মুনমুন)
* মিসেস নূরজাহান বেগম
* মোহাম্মদ মোস্তফা আলী
* ডাঃ আওলাদ হোসেন
* আহমদ তবশির চৌধুরী
* বি, এ, এম, এ, সাত্তার
* আফজাল আহমদ খাদেম
* সৈয়দ আব্দুল হান্নান
* মোহাম্মদ ফজলুল করীম মোল্লা
* মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ
* নিজামুল হক
* জাহিদুর রহমান
* আব্দুল্লাহ ইউসুফ মোহাম্মদ
* মোহাম্মদ আবদুল জলিল
* খলিলুর রহমান ভূইয়াঁ
* রফিকুল ইসলাম ভূইয়াঁ
* জুলফিকার আলম
* সিরাজুল ইসলাম * মরিয়ম সিদ্দিকা
* মীর মোজাহিদ আলী
* মীর ওয়াজেদ আলী
* ইব্রায়েতুল হাসান
* আহমদ এনামুল কবীর
* ডঃ মোজাহেদ উদ্দীন
* গিয়াস উদ্দীন আহমদ
* হাবিবুর রহমান
* শফিক আহমদ
* নূরে এলাহী
* নূরুদ্দিন আমজাদ খান চৌধুরী
* আব্দুল আলিম খান চৌধুরী
* আলহাজ্ব আকতার হোসেন
* মাকসুদা রহমান
* আবুল হোসেন
* নজির আহমদ ভূঁইয়া
* নূরুল ইসলাম চক্রবর্তী (মরহুম)
* শহিদুল ইসলাম বাবুল
* ইয়াসমিন আকতার নাজনীন
* এস, এম রহমতুল্লাহ
* সালাহ উদ্দীন আহমদ

মাহে রমযান ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে সকলের প্রতি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা। একই সাথে বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত প্রাচীনতম পত্রিকা পাক্ষিক আহমদী নতুন সাজে ফটো–কম্পিউটার পদ্ধতিতে অফসেটে মুদ্রিত করে আপনাদের হাতে তুলে দেবার যে প্রয়াস চলছে তার সফল বাস্তবায়ন কেবল তখনই সম্ভব যখন সকলের সম্মিলিত দোয়া এবং সক্রিয় সহযোগিতা এর সাথে যুক্ত হবে। তাই আমি দেশ-বিদেশের সর্বস্তরের পাঠক / পাঠিকা শুভানূধ্যায়ীদের / বিশেষ করে আহমদী ভাই-বোনদের নিকট আবেদন রাখছি আপনি নিজে এর গ্রাহক হোন ও অপরকে গ্রাহক করুন এবং এতে আপনার প্রতিষ্ঠান ও পণ্যের বিজ্ঞাপন দিন ও অপরকে বিজ্ঞাপন দিতে উৎসাহিত করুন।

বর্তমান বিশ্বের সমসাময়িক সমস্যাবলী এবং এথেকে বিশ্ব মানবতাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ লেখা দিয়ে পাক্ষিক আহমদীকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলুন।

পাক্ষিক আহমদী আমাদের সকলের সঠিক পথ–নির্দেশনার কারণ হোক পরম করুনাময়ের নিকট এ আকুতি জানাই।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

পাক্ষিক
আহমদী

নব পর্যায় ৫৯ বর্ষ ॥ ১৩শ সংখ্যা

২রা মাঘ ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ❑ ১৫ই রমযান ১৪১৮ হিঃ কাঃ
১৫ই সুলাহ্ ১৩৭৭ হিঃ শাঃ ❑ ১৫ই জানুয়ারী ১৯৯৮ ঈসাব্দ

বার্ষিক চাঁদা ঃ বাংলাদেশ ১৫০ টাকা ❑ অন্যান্য দেশে ৫০ ডলার

সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি
আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী

সম্পাদক
মকবুল আহমদ খান

সহকারী সম্পাদক
মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

বার্তা সম্পাদক
মোহাম্মদ আবদুল জলিল

প্রচার সম্পাদক
ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ তাসাদ্দক হোসেন

সহকারী শিল্প নির্দেশক
মোহাম্মদ আবদুল জব্বার ❑ মোস্তফা জামান

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি
আব্দুল আউয়াল ইমরান

হিসাব ব্যবস্থাপক
মোহাম্মদ সামসুর রহমান

সহকারী হিসাব ব্যবস্থাপক
গিয়াসুদ্দীন আহমদ

বৈদেশিক বিষয়ক উপদেষ্টা
এ, কে, রেজাউল করীম

বিদেশ প্রতিনিধি

মুহাম্মদ আব্দুল হাদী	-	লন্ডন, ইউ কে
ইসমত পাশা	-	কানাডা
মোহাম্মদ খলিলুর রহমান	-	নিউ ইয়র্ক
জাভেদ এ, মতিন	-	ক্যালিফর্নিয়া
আব্দুর রব	-	জার্মানী
কাউসার আহমদ	-	হল্যান্ড
এন, এ, শামীম	-	বেলজিয়াম
ইসমত উল্লাহ	-	জাপান
মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম	-	হংকং

তত্ত্বাবধানে : সেক্রেটারী পাবলিকেশন

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে
আহমদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড,
ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা
কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
ফোন ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬৩৪১৪

সম্পাদকীয়

নববর্ষে আহমদীর নতুন সাজ !

আমরা আমাদের অগণিত পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীগণকে পবিত্র মাহে রমযান ও নতুন বছরের শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানাচ্ছি।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র পাক্ষিক আহমদী। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এর শুভ যাত্রা। এ পত্রিকাখানা ঢাকার সবচে' পুরাতন পাক্ষিক পত্রিকা এবং সম্ভবতঃ বাংলাদেশের প্রাচীন সাময়িকীরও অন্যতম। জন্মলগ্ন থেকে হাঁটি হাঁটি পা পা করে মন্থর গতিতে এটা এগুচ্ছে ; বরং বলা যায় এখন পুরোপুরি হাঁটতে শিখেছে। একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, এতদিনে পাক্ষিকটি সাপ্তাহিক কেন চাহিদার প্রেক্ষিতে দৈনিকে রূপ নেয়া উচিত ছিলো।

এ যুগ মসীহ্-মাহদী (আঃ)-এর যুগ– এ যুগ পত্র-পত্রিকার ব্যাপকতার যুগ (সূরা তাকভীর)। এ যুগে পত্র-পত্রিকার প্রয়োজনীয়তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। পত্র-পত্রিকা গোটা জগতের মানুষকে একই উঠোনে এনে সমবেত করতে সক্ষম হয়েছে। ভাব বিনিময়ের একটি উৎকৃষ্ট মাধ্যম হচ্ছে এ পত্র-পত্রিকা। একটি সফল পত্রিকা যে কোন মতবাদকে প্রচার করতে যে কতজন মুবাল্লিগের (প্রচারক) আঞ্জাম দিতে পারে তার হিসাব করা দুরূহ ব্যাপার। মোটকথা তবলীগের ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকার গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এ গুরুত্বকে উপলব্ধির ফলেই বিশ্বের ১৫৩টিরও অধিক দেশ থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ভাষায় শতাধিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। কেবল মাত্র জামাতের বিশ্ব-কেন্দ্র রাবওয়া থেকেই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে ডজন খানেক পত্র-পত্রিকা। অথচ বাংলাদেশ থেকে আমাদের নিয়মিত পত্রিকা মাত্র একটিই বের হচ্ছে ; তা-ও আবার অনেক দৈন্য দশা নিয়ে।

আনন্দের বিষয় যে, বর্তমান সংখ্যা থেকে পাক্ষিক আহমদী নতুন সাজে সজ্জিত হয়ে নতুন আকারে বেরুচ্ছে। এখন থেকে পত্রিকা কম্পিউটার কম্পোজ হয়ে নতুন নতুন প্রচ্ছদে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ্। এজন্যে আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। একথা সকলেই অকপটে স্বীকার করবেন যে, পত্রিকার গ্রাহকগণের পৃষ্ঠপোষকতা ব্যতিরেকে পত্রিকা সঠিকভাবে চলতে পারে না।

পত্রিকার মানোন্নয়নের সাথে সাথে পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়। তাই পাক্ষিক আহমদীর সম্মানিত পাঠক–পাঠিকাকে সময়ের গুরুত্ব ও চাহিদা সম্পর্কে সচেতন করে তাদের সবিশেষ সহযোগিতা কামনা করছি। আশা করি তাদের পুরোপুরি সহযোগিতা পেলে পত্রিকাটি অচিরেই সাপ্তাহিক করা সম্ভব হবে, ইন্‌শাআল্লাহ্।

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃঃ
❑ কুরআন মজীদ (তফসীর সহ)	ঃ 'কুরআন মজীদ' থেকে	৩-৪
❑ হাদীস শরীফ	ঃ অনুবাদ ও ব্যাখ্যা– মাওলানা সালেহ আহমদ	৫
❑ অমৃতবাণীঃ হযরত ইমাম-মাহদী (আঃ) 'রোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে	ঃ অনুবাদ-সাহেবুল কাহ্‌ফ	৬
❑ মোল্লাতন্ত্র পাকিস্তানের প্রধান শত্রু সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ-মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	৭-১৫
❑ হাকীকাতুল ওহীঃ মূল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)	ঃ অনুবাদ-নাজির আহমদ ভূঁইয়া	১৬-১৮
❑ ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব) মূলঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ(রাঃ)	ঃ অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	১৯-২০
❑ খতমে নবুওয়ত ও আহ্‌মদীয়া জামাত মূলঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর লায়েলপুরী	ঃ ভাষান্তর-এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার (মরহুম)	২১
❑ পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত	ঃ মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২২
❑ কুরআনী জিন্দেগী	ঃ সংকলক– খোন্দকার আজমল হক	২৪
❑ ছোটদের পাতা (রোযা সম্পর্কে জ্ঞাতব্য)	ঃ পরিচালক-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৫-২৮
❑ শহীদ হওয়ার তাৎপর্য ও নামাযে ধৈর্যাবলম্বন সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের্ রাবে' (আইঃ)	ঃ অনুবাদ -মাওলানা বশীরুর রহমান	২৯-৩৫
❑ ডে'-নাইট-এর মিথ্যাচার!	ঃ সাহেবুল কাহ্‌ফ	৩৫
❑ সংবাদ	ঃ	৩৬

অফিস সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট আবশ্যক

বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্‌র অফিসের জন্য একজন অফিস সহকারী-কাম-টাইপিষ্ট আবশ্যক। নিম্নলিখিত যোগ্যতাসম্পন্ন আহমদী সদস্যগণের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্‌বান করা যাচ্ছে।

১। প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা সর্বনিম্ন এইচ, এস, সি, পাস।

২। বাংলা ও ইংরেজী টাইপ জানা আবশ্যক।

৩। প্রার্থীকে অবশ্যই স্থানীয় জামাতের প্রেসিডেন্ট সাহেবের এবং আনসারুল্লাহ্‌র সদস্য হলে স্থানীয় মজলিসের যয়ীম থেকে ও খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য হলে কায়েদের নিকট থেকে চরিত্রগত সনদপত্র দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

৪। সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি দরখাস্তের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের আগামী ১৫ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮ইং তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দরখাস্ত পৌছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

আবদুল জলিল
কায়েদে উমুমী
বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ্
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

কুরআন মজীদ

সূরা আল্ বাকারা

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

১৮৫। (ফরয রোযা) নির্দিষ্ট দিনগুলিতে, কিন্তু তোমাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত হয় অথবা সফরে থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অন্য সময়ে এই সংখ্যা পূর্ণ করিতে হইবে, এবং যাহাদের পক্ষে ইহা (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, ২০৭ তাহাদের উপর ফিদিয়া –একজন মিসকীনকে আহার্য দান করা। অতএব, যে কেহ স্বেচ্ছায় পুণ্যকর্ম করিবে, উহা অবশ্য তাহার জন্য উত্তম হইবে। বস্তুতঃ তোমরা যদি জ্ঞান রাখ তাহা হইলে জানিও যে, তোমাদের জন্য রোযা রাখাই কল্যাণকর।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى
لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ
مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٦﴾

১৮৬। রমযান ২০৭-ক সেই মাস যাহাতে নাযেল ২০৮ করা হইয়াছে কুরআন ২০৭-খ যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াতস্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী)বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদিস্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে২০৯ গণনা পূর্ণ করিবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ﴿١٨٧﴾

১৮৭। এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল), 'নিশ্চয় আমি নিকটে২১০ আছি। আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমারে ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান২১১ আনে যাহাতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।'

২০৭। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ করা হইয়াছে, যাহাদের পক্ষে ইহ ক্ষমতাতীত বা যাহারা অতিকষ্টে ইহা (রোযা) করিতে পারে। অন্যপাঠ 'ইয়ুতাঈকুনাহু' এ অর্থকে সমর্থন করে (জরীর)। এই আয়াতে তিন শ্রেণীর বিশ্বাসীকে রোযার ব্যাপারে কিছুটা রেহাই বা সুবিধা দেওয়া হইয়াছে- অসুস্থ, ভ্রমণরত এবং অতি দুর্বলদিগকে। 'ইয়ুতিকুনাহু'র অর্থ এখানে "যাহারা রোযা রাখিতে অসমর্থ" হইতে পারে (লিসান ও মুফরাদাত)। সমস্ত বাক্যটির অর্থ এইরূপও করা হইয়াছে, "রোযা রাখা ছাড়াও, অতিরিক্ত পুণ্য অর্জনের জন্য সামর্থ্যবান ও অবস্থাসম্পন্ন ব্যক্তিগণ" গরীবদিগকে খাওয়াইতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে 'ইয়ুতিকুনাহু'র 'হু' সর্বনামটি একজন গরীবকে "খাওয়ানোর" পরিবর্তে ব্যবহৃত হইবে।

২০৭-ক। 'রমযান' চান্দ্রমাসগুলির মধ্যে নবম মাস। শব্দটি 'রামাযা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। 'রামাযাস্ সায়মু অর্থ রোযা করার কারণে রোযাদারের ভিতরটা তৃষ্ণায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে (লেইন)। মাসটির নামকরণ এই কারণে হইয়াছে। (১) রোযার কারণে এই মাসটিতে মানুষের তৃষ্ণা ও জ্বালা বৃদ্ধি পায়, (২) এই মাসের ইবাদত-বন্দেগী মানুষের পাপকে জ্বালাইয়া-পুড়াইয়া নিঃশেষ করে (আসাকির ও মারদাওয়াই), (৩) এই মাসে মানুষের তপস্যা ও সাধনা তাহার মনে স্রষ্টার প্রতি ভালবাসার উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং মানবের প্রতি সহানুভূতির উদ্রেক করে। 'রমযান' নামটি ইসলামের অবদান। এই মাসটির পূর্বনাম ছিল নাতিক (কাদীর)।

২০৭-খ। 'আল্ কুরআন' শব্দটি 'কারাআ' হইতে উৎপন্ন। 'কারআ' অর্থ সে পাঠ করিয়াছিল, সে বাণী পৌছাইয়াছিল, সে সংগ্রহ করিয়াছিল। 'কুরআন' অর্থ (১) পঠনের উপযোগী পুস্তক, যাহা বার বার পাঠ করা যায়; 'কুরআন বিশ্বের সর্বাধিক পঠনীয় পুস্তক' (এন্‌সাইক্লো-বৃট), (২) একটি পুস্তক কিংবা বাণী যাহা পৃথিবীর সর্বত্র নিয়া যাওয়া ও পৌছানো প্রয়োজন, কুরআনই একমাত্র পুস্তক যাহার বাণী সারা বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণরূপে অবারিত। কেননা, যেখানে অন্যান্য অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থাদি স্থান, কাল ও পাত্রে সীমাবদ্ধ, সেখানে কুরআনই একমাত্র অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ যাহা সকল দেশ, সকল জাতি ও সকল সময়ের জন্য আসিয়াছে (৩৪ঃ২৯), (৩) এমন গ্রন্থ যাহা সকল সত্যকে ধারণ করে; কুরআনই একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যাহা যাবতীয় জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। ইহাতে অন্যান্য অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীর শাশ্বত সত্যগুলি তো স্থান পাইয়াছেই, উপরন্ত সর্বাবস্থায় সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় অনেক নতুন নতুন শিক্ষা ও সত্য হইতে সংযোজিত হইয়া, ইহা সর্বকালের জন্য পূর্ণতম গ্রন্থে পরিণত হইয়াছে (৯৮ঃ৪, ১৮ঃ ৫০)।

২০৮। রমযান মাসেরই চব্বিশ তারিখে, হযরত রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম আল্লাহ্‌র বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (জরীর)। এই রমযান মাসেই, হযরত জিব্‌রাঈল প্রতি বৎসর পূর্বে নাযেলকৃত সমস্ত বাণী রসূলে করীম (সাঃ)-এর নিকট পুনরাবৃত্তি করিতেন। এই ব্যবস্থা মহানবী (সাঃ)-এর জীবনের শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তাঁহার জীবনের শেষ বৎসরের রমযান মাসে প্রধান ফিরিশ্‌তা হযরত জিব্‌রাঈল পূর্ণ কুরআনকে মহানবী (সাঃ)-এর কাছে দুইবার পাঠ করিয়া শুনান (বুখারী)। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, সমগ্র কুরআনই রমযান মাসে অবতীর্ণ হইয়াছে।

২০৯। এই বাক্যটি অপ্রয়োজনীয় পুনরুক্তি নয়। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতে মনস্তাত্ত্বিক প্রস্তুতির ক্ষেত্র গঠনের জন্য এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছিল, যাহাতে রোযা রাখার নির্দেশ তাহারা সহজে গ্রহণ করিতে পারে। এই আয়াতে ঐ নির্দেশেরই বাস্তবায়নকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বাক্যটি ব্যবহৃত হইয়াছে। এখানে বাক্যটি নির্দেশেরই অঙ্গ-বিশেষ। 'অসুখ', 'ভ্রমণ' শব্দগুলিকে সংজ্ঞায়িত না করিয়া, কুরআন মানুষের সাধারণ বুদ্ধি-বিবেচনা ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে শব্দগুলির অর্থ করার ভার ছাড়িয়া দিয়া বিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখাইয়াছে।

২১০। যখন মানুষ রমযান মাসের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে ও এই মাসে রোযা রাখার পুণ্য ও আশীর্বাদরাশির সম্বন্ধে অবগত হয়, তখন তাহারা স্বভাবতঃই ইহা হইতে খুব বেশী আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভের আশা পোষণ করিয়া থাকে। মো'মেনের এই আশা-আকাঙ্খার প্রত্যুত্তরে, এই আয়াতটি মো'মেনের আত্মাকে নিশ্চয়তা দান করিতেছে।

২১১। "আমার উপর ঈমান আনে" এই বাক্যটির অর্থ এই স্থলে, আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে ঈমান আনা বা বিশ্বাস করা অর্থে নহে। কারণ পূর্ববতী বাক্যেই বলা হইয়াছে "তাহারা যেন আমার ডাকে সাড়া দেয়।" অস্তিত্বে বিশ্বাস না করিলে, সাড়া দেওয়ার কথাই আসিত না। অতএব, "আমার উপর ঈমান আনে" অর্থ এই কথার উপার বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার প্রার্থনা শুনেন এবং মঞ্জুর করেন।

২১২। কী চমৎকারভাবে একটি মাত্র বাক্যে কুরআন স্ত্রীলোকের অধিকার ও মর্যাদাকে বর্ণনা করিয়াছে এবং বিবাহের উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য এবং স্বামী-স্ত্রীর

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ
كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا
عَنكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ
مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ
إِلَى اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ
تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٨﴾

১৮৮। রোযার রাত্রে তোমাদের জন্য তোমাদের স্ত্রী-গমন বৈধ করা হইয়াছে। তাহারা তোমাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক,[২১২] এবং তোমরা তাহাদের জন্য এক (প্রকারের) পোশাক। আল্লাহ্ অবগত আছেন যে, তোমরা তোমাদের নিজেদের অধিকার খর্ব করিতেছিলে, অতএব আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি সদয়দৃষ্টিপাত করিলেন এবং তোমাদের এই অবস্থার সংশোধন[২১৩] করিলেন। অতএব, এখন তোমরা তাহাদের নিকট গমন কর এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য যাহা বিধিবদ্ধ করিয়াছেন উহা অনুসন্ধান কর; এবং তোমরা আহার কর এবং পান কর যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের নিকট উষার শুভ্ররেখা কৃষ্ণরেখা হইতে পৃথক দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর, রাত্রি[২১৪] (আগমন) পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর; এবং তোমরা মসজিদ[২১৫] সমূহে যখন এ'তেকাফে থাক তখন তোমরা স্ত্রী-গমন করিও না। এইগুলি হইতেছে আল্লাহ্‌র সীমাসমূহ, অতএব তোমরা ইহাদের নিকটে যাইও না; এইভাবে আল্লাহ্ তাঁহার নিদর্শনাবলী মানবজাতির জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন, যেন তাহারা তাক্ওয়া অবলম্বন করে।

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٩﴾

১৮৯। এবং তোমরা তোমাদের ধন সম্পদ[২১৫-ক] তোমাদের পরস্পরের মধ্যে অন্যায় ভাবে[২১৬] গ্রাস করিও না, এবং উহাকে কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করিও না যাহাতে লোকের ধন-সম্পদের কোন অংশ তোমরা জানিয়া শুনিয়া অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করিতে পার।

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ
وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا
وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٩٠﴾

১৯০। তাহারা তোমাকে নূতন চাঁদ সম্বন্ধে জিজ্ঞসা করে, তুমি বল, 'ইহা লোকদের (সাধারণ কাজের) জন্য এবং হজ্জের জন্য সময় নির্ণয়ের[২১৭] উপকরণস্বরূপ।' এবং ইহা উত্তম পুণ্য নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ[২১৮] দিক দিয়া প্রবেশ কর, বরং পূর্ণ পুণ্যবান সেই ব্যক্তি যে তাক্ওয়া অবলম্বন করে। এবং তোমরা গৃহে উহার দ্বার দিয়া প্রবেশ কর আর আল্লাহ্‌র তাক্ওয়া অবলম্বন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

সম্পর্ককে তুলিয়া ধরিয়াছে! এই আয়াত বলিতেছে – বিবাহের উদ্দেশ্য হইল দম্পতির শান্তিলাভ, আত্ম-সংরক্ষণ এবং সৌন্দর্য বর্দ্ধন। কেননা, পোশাকের কাজও তাহাই (৭ঃ২৭, ১৬ঃ৮২)। বিবাহের উদ্দেশ্য কেবল কাম-বৃত্তি চরিতার্থ করা নহে। স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরকে মন্দকাজ ও কুৎসা হইতে রক্ষা করা।

২১৩। "আফা আল্লাহ্ আনহু" অর্থ আল্লাহ্ তাহার ভ্রম সংশোধন করিয়া, তাহার কাজকর্ম ঠিক করিয়া দিলেন; আল্লাহ্ তাহাকে সম্মান দিলেন। ইহার অন্য এক অর্থ হইল, আল্লাহ্ তাহাকে উদ্ধার করিলেন (মুহীত)।

২১৪। যে সব দেশে দিন ও রাত্রি অতিমাত্রায় দীর্ঘ (যেমন, মেরু অঞ্চল), সেখানে দিন ও রাত্রির দৈর্ঘ প্রতি ১২ ঘন্টার হিসাবে গণনা করিতে হইবে (মুসলিম, বাবু আশরাত আস্‌সায়াত)।

২১৫। এ'তেকাফে থাকা অবস্থায় দিনে এবং রাত্রিতে স্ত্রী-গমন কিংবা তাৎসন্নিহিত অন্য কিছু নিষিদ্ধ। কেননা, রোযার আত্মিক সুফলকে পূর্ণতার দিকে পৌছানোর জন্য দিবা-রাত্র চেষ্টা-সাধনা করার নামই এ'তেকাফ।

২১৫-ক। সাম্প্রদায়িক ঐক্যকে জোর দিবার উদ্দেশ্যে মুসলমানের ধন-সম্পদকে কুরআনে "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিয়া অনেক সময় উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানেও "তোমাদের ধন-সম্পদ" বলিতে মুসলমানদের ধন-সম্পদ বুঝাইতেছে।

২১৬। রোযা রাখার নির্দেশ, মুসলমানদের উপর কর্তব্য নির্ধারণ করিয়াছে যে, তাহারা যেন একটা নির্দ্ধারিত সময় ব্যাপী খাদ্য-পানীয় হইতে বিরত থাকে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে পুণ্য ও ধর্মপরায়ণতা জাগ্রত হয়। তাই, ইহাই উপযুক্ত সময়, যখন তাহাদিগকে মনে করাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, তাহারা যেন অবৈধ খাদ্যাদি হইতে বিরত থাকে অর্থাৎ তাহারা যেন সজ্ঞান অবৈধ উপার্জন হইতে আত্মরক্ষা করে। কথাচ্ছলে, এই আয়াত ঘুষ দেওয়া-নেওয়াকে অত্যন্ত ঘৃণ্য কাজ বলিয়া নিন্দা করিয়াছে।

২১৭। ইসলাম সময় পরিমাপের জন্য চান্দ্র ও সৌর উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করে। যেখানে দিনের বিভিন্ন সময়ে নামায পড়ার হুকুম আসিয়াছে সেখানে সময় গণনায় সৌর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, পাঁচ বার নামায পড়ার সময় নির্দ্ধারণ এবং রোযা আরম্ভ করা ও সমাপ্ত করার ব্যাপারে সৌর পদ্ধতি অবলম্বিত হয়। আবার যখন কোনও ধর্ম-কর্মের সম্পাদন, মাস বা মাসের অংশ বিশেষের জন্য নির্দ্ধারিত করা হয় তখন চান্দ্র পদ্ধতি অবলম্বিত হয়, যথাঃ রোযা রাখার মাস বা হজ্জ পালনের তারিখ নির্দ্ধারণে। এইভাবে, ইসলাম উভয় পদ্ধতির ব্যবহার করিয়া, উভয় পদ্ধতিকেই ইসলামসম্মত মনে করে।

২১৮। "ইহা উত্তম পুণ্য নহে যে তোমরা গৃহে উহার পশ্চাৎ দিক দিয়া প্রবেশ কর" এই বাক্যটি একটি নীতি নির্দ্ধারণী বাক্য। উপাসনার বিভিন্ন রূপ ও পদ্ধতির উদ্দেশ্য ঐ উপাসনার উপকারিতার মধ্যেই অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। প্রত্যেক বেলা পরিবর্তনের সাথে সাথে একটা একটা করিয়া উপাসনা সম্পন্ন রাখার মধ্যে কোন সার্থকতা নাই। বিশ্বাসীগণের অতি-উৎসাহিতা হইতে উদ্‌গত প্রশ্ন-উপবাস ব্রতের মত অন্যান্য মাসেও অন্যান্য ধরনের উপাসনা থাকা দরকার-এইরূপ কথাকে, গৃহের সদর দরজা দিয়া প্রবেশ না করিয়া "পিছন দিক দিয়া প্রবেশ করার" সাথে তুলনা করা যাইতে পারে। আসল বিষয়টি হইল ইবাদত, সময় হইল গৌণ। কিন্তু প্রশ্নটিতে সময়কে মুখ্য ও ইবাদতকে গৌণ দেখাইতেছে। ইহা যেন, ঘোড়ার সামনে গাড়ী বাঁধার মত। কথাটিতে পৌত্তলিক আরবদের একটি কুপ্রথার প্রতি ইঙ্গিত আছে বলিয়া মনে হয়। তাহারা মক্কায় হজ্জ করিতে যাইয়া যদি কোনও কারণে হজ্জ না করিয়া গৃহে ফিরিত, তাহা হইলে তাহারা সম্মুখে দ্বার দিয়া গৃহে প্রবেশ না করিয়া, পিছন দিকের দেওয়াল টপকাইয়া গৃহে আসিত। আয়াতটি এই বদভ্যাসকে নিন্দা করিতেছে, কেননা এরূপ করাতে কোনই পুণ্য নাই। পুণ্য তো একটা আধ্যাত্মিক বিষয়, যাহা আধ্যাত্মিক কর্মের ফলে প্রাপ্ত হওয়া যায়। আয়াতটিতে এই উপদেশ নিহিত রহিয়াছে যে, উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন অপরিহার্য (বুখারীঃ কিতাবুত্ তফসীর)।

হাদীস শরীফ

রোযা

কুরআন ঃ

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٤﴾

অর্থাৎ হে যারা ঈমান এনেছো ! তোমাদের উপর রোযা বিধিবদ্ধ করা হলো যেভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর ইহা বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যেন তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করতে পারে (আল্ বাকারা ঃ ১৮৪)।

হাদীস ঃ

وَعَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِىِّ اَنَّهٗ حَدَّثَهٗ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ اَتْبَعَهٗ سِتًّا مِّنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ —رواه مسلم

অর্থাৎ হযরত আবূ আইয়্যুব (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রমযানের রোযা রাখে এবং পরবর্তীতে (ঈদ বাদ দিয়ে) শওয়াল মাসের ছয়টি রোযা রাখে সেক্ষেত্রে সে যেন গোটা বছরই রোযা রাখলো (মুসলিম)।

عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

অর্থাৎ হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমান ও পূর্ণাঙ্গীন শর্তাবলী সহকারে রমযানের (রোযা) রাখে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ্ ক্ষমা করে দেয়া হয় (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ রমযান একটি পবিত্র মাস। এ মাসের ইবাদত খোদার নিকট সবচে' প্রিয়। কারণ, নামায ও রোযার সমন্বয় মানুষের মধ্যে খোদার নৈকট্য লাভের এক আলোড়ন সৃষ্টি করে দেয়। তা এভাবে যে, নামায আত্মাকে পবিত্র করে এবং রোযা হৃদয়কে আলোকিত করে। ফলশ্রুতিতে নিষ্ঠাবান ব্যক্তি রোযা দ্বারা আধ্যাত্মিকতার এক নতুন রাস্তায় পরিচালিত হয়ে খোদার সন্তুষ্টির ছায়াতলে চলে আসে। কুরআন বলে যে, রোযা তোমাদের মাঝে তাকওয়া অর্থাৎ খোদাভীতি সৃষ্টি করবে। এই তাকওয়া কীভাবে সৃষ্টি হবে ? বস্তুতঃ রোযা এমন ইবাদত যা মানুষের প্রতিটি ইন্দ্রীয়কে খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি ইন্দ্রীয়কে নিয়ন্ত্রণ না রেখে কেউ রোযা রাখে তবে উহা রোযা নয় বরং অন্য কিছু। খোদা-ভীতির সৃষ্টি এভাবেই হয় যে, মানুষ খোদার সন্তুষ্টির জন্যে নিজের মন-মেজায ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে খোদার ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দেয়। ফলে ধীরে ধীরে তার অবাধ্য আত্মা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ঐ সকল কর্ম হতে সে দূরে সরে পড়ে যা খোদার অসন্তুষ্টির কারণ হয়।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযার কথা উল্লেখ করে ইহার গুরুত্ব বর্ণনা করছেন যে, রমযানের ৩০টি ও শাওয়ালের ৬টি রোযা মোট ৩৬টি রোযা যে রাখবে সে যেন সারাটা বছর রোযা রাখার সওয়াব পেল। এক হাদীসে আছে, এক রোযার দশটি সওয়াব। এভাবে ৩৬X১০ মোট ৩৬০ হয় অর্থাৎ ৩৬০ দিন রোযা।

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যদি কেউ রোযা পূর্ণ শর্তাবলীর সাথে পালন করে তবে তার পূর্বেকার সকল গুনাহ্ মাফ করে দেয়া হবে। ইহার অর্থ হলো, রমযান তাকওয়ার সৃষ্টি করে থাকে। যদি কেউ রোযা পালনের মাধ্যমে এ তাকওয়া নিজের মাঝে সৃষ্টি করে নেয় ও তওবাতুন নাসূহ্ (অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গীন তওবা দ্বারা নিজের সংশোধন করে নেয়। আর কখনও গুনাহ্র দিকে ফিরে তাকায় না) করে, তাহলে এমন ব্যক্তির প্রতি খোদা দয়া পরবশ হয়ে তার গুনাহ্ মাফ করে দেন। রোযার মাস সংযমের মাস, সাধনার মাস। আসুন এই রমযানে আমরা চেষ্টা করি, সাধনা করি যেন আমাদের অবাধ্য আত্মা অর্থাৎ 'নফসে আম্মারা' (অবাধ্য আত্মা) প্রশান্তি প্রাপ্ত আত্মাতে অর্থাৎ নাফসে মুতমাইন্নাতে পরিণত হয়। আল্লাহ্তাআলা আমাদের সবাইকে পবিত্র রমযান মাসে এ সাধনা করার তৌফীক দিন, আমীন।

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ঃ **মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী**

আহমদীয়াতের বিরোধিতায় নেতৃত্বদানকারী, মিথ্যা অপবাদদানকারী ও কুৎসা রটনাকারী লোকদের বিরোদ্ধে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন ঃ

اللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা। লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্ ! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খন্ড-বিখন্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্র অভিসম্পাত !

অমৃত বাণী

দোয়ার জলসার কার্য-বিবরণী

[ইহা ১৯০২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর ঘোষণানুযায়ী কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয়]

(অষ্টম কিস্তি)

দ্বিতীয় শর্ত হলো ঈমান বা বিশ্বাস ঃ

যদি খোদাতাআলা ও তাঁর আদেশ নিষেধের প্রতি বিশ্বাসই না থাকে এবং অভ্যন্তরভাগ বিধর্ম ও নাস্তিকতার বিষে আক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলেও ঐশী আদেশ-নিষেধ পালিত হতে পারে না। কারণ এই যে, বহু লোক বলে থাকে – এইহা জাগ মিঠহাতে আগলা মিন ডিট্হা অর্থাৎ এ জগৎ তো মিষ্ট দেখাই যায়, পরজগৎ কে দেখেছে! দুঃখের কথা এই যে, দুই ব্যক্তির সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে এক অপরাধীর ফাঁসী হতে পারে কিন্তু এক লাখ চব্বিশ হাজার নবী এবং অসংখ্য আওলীয়াগণের সাক্ষ্য মজুদ থাকা সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত এ ধরনের নাস্তিকতা লোকদের অন্তর থেকে দূর হয়নি। প্রত্যেক যুগেই খোদাতাআলা স্বীয় শক্তিশালী নিদর্শনসমূহ ও অলৌকিক ঘটনাসমূহের দ্বারা বলছেন – আনাল মওজুদ অর্থাৎ আমি আছি ; কিন্তু এসব মুর্খরা কান থাকা সত্ত্বেও শুনছে না। মোটকথা এ শর্তও খুবই আবশ্যকীয় শর্ত। এজন্যেও আমাদের ইংরেজ সরকারের কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হওয়া উচিত। কেননা, ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার জন্যে সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন ছিলো, আর ধর্মীয় শিক্ষায় বিস্তৃতি ধর্মীয় পুস্তকাদির প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত। প্রেস ও ডাক বিভাগের কল্যাণে সর্বপ্রকার ধর্মীয় পুস্তকাদি পাওয়া যেতে পারে। আর পত্র-পত্রিকাদির মাধ্যমে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার আদান-প্রদান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যায়।

পুণ্যস্বভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গের বড়ই সুযোগ লাভ হয়েছে যেন তারা ঈমান ও ধর্মীয় বিশ্বাসে দৃঢ়তা লাভ করে। এসব কথা বাদেও ঈমানের দৃঢ়তার জন্যে যা **আবশ্যক ও খুবই আবশ্যক** কথা তাহলো খোদাতাআলার ঐসব নিদর্শন যা ঐসব ব্যক্তির হাতে প্রকাশিত হয় – যাঁরা খোদাতাআলার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট হয়ে আসেন এবং স্বীয় কর্ম-কান্ড দ্বারা হারানো সত্যতাসমূহ ও তত্ত্বজ্ঞানকে জীবিত করেন। সুতরাং খোদাতাআলার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, তিনি এ যুগে এমন **ব্যক্তিকে পুনরায় ঈমান সঞ্জীবিত করার জন্যে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন** এবং এজন্যে প্রেরণ করেছেন যেন লোকেরা দৃঢ়-বিশ্বাসের শক্তিতে উন্নতি করে। তিনি এ কল্যাণকামী সরকারের শাসনামলে আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি কে? **তিনিই যিনি তোমাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।** যেহেতু ইহা স্বীকৃত কথা যে, যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে ঈমান লাভ না হয়, পুণ্যকর্মে মানুষ বুৎপত্তি লাভ করতে পারে না। যতই কোন দিক দিয়ে বা কোন অংশে ঈমানের কমতি থাকবে ততই মানুষ কর্মে শিথিল থাকবে এবং দুর্বল হবে। এর ভিত্তিতে তাকে ওলী বলা হয় যার প্রত্যেকটি দিক স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। আর তিনি কোন দিক দিয়েই দুর্বল নন। তার ইবাদতগুলো উৎকর্ষ ও পূর্ণতার পোষাকে সজ্জিত। মোটকথা ঈমানের দ্বিতীয় শর্ত হলো নিরাপত্তা।

মানবের জন্যে **তৃতীয় শর্ত** হলো আর্থিক শক্তি। মসজিদ নির্মাণ ও ইসলামের অন্যান্য কর্মকান্ড বাস্তবায়ন আর্থিক শক্তির ওপরে নির্ভরশীল। এতদ্ব্যতিরেকে সামাজিক জীবন ও অন্যান্য সব বিষয়ে বিশেষ করে মসজিদের ব্যবস্থাপনা খুবই কষ্টসাধ্য। এখন এ দিক থেকে ইংরেজ সরকারকে দেখো ! সরকার সব রকমের ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি এনে দিয়েছে, শিক্ষা বিস্তার করে দেশের অধিবাসীগণকে চাকুরী প্রদান করেছে এবং কতককে বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত করেছে। যাতায়াতে স্বাচ্ছন্দ্য এনে অন্যান্য দেশে গিয়ে টাকা-পয়সা রোজগারেও সাহায্য করেছে। সুতরাং ডাক্তার, উকিল, আদালতের কর্মকর্তা, শিক্ষা বিভাগের সেরেস্তাদারদের দেখো। মোট কথা অনেক পন্থায় মানুষ সদুপার্জন করছে। আর ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়োজিত ব্যবসায়ীগণ বহু রকমের ব্যবসায়ী পণ্য বিলাত ও দূরবর্তী দেশসমূহে – আফ্রিকা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে নিয়ে গিয়ে সম্পদশালী হয়ে ফিরে আসছে। মোটকথা সরকার আয়ের পথকে সুগম করে দিয়েছেন এবং টাকা-পয়সা উপার্জনের বহু উপায় উদ্ভাবন করে দিয়েছেন।

চতুর্থ শর্ত হলো নিরাপত্তা। এ নিরাপত্তার শর্ত মানুষের নিজস্ব আয়ত্বাধীন নয়। যখন থেকে পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে উহার সীমা বিশেষ বিশেষ সাম্রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সাম্রাজ্য যতই পুণ্য সৎকল্পের অধিকারী হবে আর উহার অন্তর বক্রতা থেকে পবিত্র হবে ততই এ শর্ত অধিক পরিমাণে স্বচ্ছতায় ভরপুর হবে। এখন এ যুগে নিরাপত্তার শর্ত – উন্নত মানে পূর্ণ হতে আরম্ভ করেছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস যে, শিখদের আমলের দিন ইংরেজদের আমলের রাত থেকে নিম্নমানের ছিলো। এখান থেকে দেশের সীমানার অদূরে একটি গ্রাম আছে। *(এই মৌযা কাদিয়ান শরীফ থেকে দু'মাইল দূরে হবে।)* এখান থেকে যদি কোন মহিলা সেখানে যেত তাহলে কেঁদে কেটে বুক ভাসিয়ে দিতো যে, ফিরে আসতে পারে কি না পারে। এখন এমন অবস্থা হয়েছে যে, মানুষ দেশের দূর-দূরান্ত পর্যন্ত চলে যায় তাদের কোন প্রকার বিপদ নেই। যাতায়াতের ব্যবস্থা এমন সহজ করে দেয়া হয়েছে যে, সব রকমের আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা হয়েছে। মোটকথা ঘরের মত রেলে বসে বা শুয়ে যেভাবে চাও যেতে পারো। প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তার জন্যে পুলিশের ব্যাপক ব্যবস্থাপনা করা হয়েছে। অধিকার রক্ষার ব্যাপারে আদালত খোলা হয়েছে। যত চাও নালিশ করতে পারো। ইহা কতই না অনুগ্রহ যা আমাদের কর্মের স্বাধীনতার কারণ হয়েছে। অতএব যদি এমন অবস্থায় যখন কিনা দেহ ও আত্মার ওপরে অশেষ অনুগ্রহ বর্ষণ হচ্ছে তখন আমাদের মধ্যে শান্তিজ্ঞাপক ও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক স্বভাব সৃষ্টি না হলে ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা ঃ যে সৃষ্ট জীবের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না সে খোদাতাআলারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারে না, এর কারণ কি? ইহা এজন্যে যে, ঐ সৃষ্ট জীবও তো খোদারই অনুদান। আর খোদাতাআলার ইচ্ছার অধীনে জীবন যাপন করে থাকে। মোট কথা এসব বিষয়াদি যা আমি বর্ণনা করেছি তা একজন পুণ্যবান ব্যক্তিকে বাধ্য করবে যে, সে এমন অনুগ্রহশীল সরকারের কৃতজ্ঞতাপরায়ণ হয়। আর এর কারণ ইহাই যে, আমি বারে বারে আমার লেখার মধ্যে এবং নিজের বক্তৃতাদির মধ্যে ইংরেজ সরকারের অনুগ্রহসমূহের উল্লেখ করে থাকি। কেননা, আমাদের প্রাণ প্রকৃতই উহার অনুগ্রহরাজির স্বাদে ভরপুর। অকৃতজ্ঞ মুর্খ নিজের কপটতাসুলভ স্বভাববশতঃ অনুমান করে আমাদের এ কর্ম-পদ্ধতিকে, যা সত্যতা ও নিষ্ঠার কারণে সৃষ্টি হয়. মিথ্যা চাটুকারিতারূপে প্রতিপন্ন করে। (চলবে)

('বোয়েদাদ জলসা দোয়া' পুস্তক থেকে অনূদিত-সাহেবুল

জুমুআর খুৎবা

মোল্লাতন্ত্রই পাকিস্তানের প্রধান শত্রু

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা, ১২ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে ফযল, লণ্ডন।

তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযূর (আইঃ) সূরা আল্ আন্আমের ৬৬-৬৭ তম আয়াত তেলাওয়াত করেনঃ

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلٰٓى اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ اَوْ مِنْ تَحْتِ اَرْجُلِكُمْ اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَّيُذِيْقَ بَعْضَكُمْ بَاْسَ بَعْضٍ ۭ اُنْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُوْنَ ۝

وَكَذَّبَ بِهٖ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ ۭ قُلْ لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ ۝

অতঃপর হুযূর বলেন, এ আয়াত-সমূহের তরজমা হচ্ছে ঃ "তুমি তাদের বলে দাও, তিনি এ বিষয়ে সর্বক্ষম যে, তিনি তোমাদের উপর তোমাদের ঊর্ধ্বদেশ হতে অথবা তোমাদের পদতল হতে শাস্তি প্রেরণ করেন অথবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দলে (বিভক্ত ক'রে) সংঘর্ষে লিপ্ত করেন এবং তোমাদের কতকজনকে কতকজনের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করান। লক্ষ্য কর, কীরূপে আমরা এই দলিল ও নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করি যেন তোমরা বুঝতে পার। এবং তোমার জাতি ইহাকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ সাঃ-এর পয়গাম ও আহ্বানকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে, অথচ ইহাই সত্য, তুমি বল, আমি তোমাদের উপর দায়বদ্ধ ও তত্ত্বাবধায়ক নই। প্রত্যেক ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জন্য এক নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারিত আছে, এবং অচিরেই তোমরা (এর বাস্তবতা) জানতে পারবে"।

এইগুলো হচ্ছে ঐ সকল আয়াত, যা সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশটির (পাকিস্তান) উপর হুবহু প্রযোজ্য হচ্ছে। এবং এই জাতি যে তাদের যুগ-ইমামকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যিনি ছিলেন হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সত্য ও সাচ্চা প্রতিনিধি, তদ্রূপ করার দরুন কার্যতঃ তারা হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর (সুস্পষ্ট) ভবিষ্যদ্বাণীসমূহের অস্বীকার করে তাঁকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। যদিও তারা মুখে তা স্বীকার করুক বা না করুক, এ বাস্তব ঘটনা তারা কখনও রদ করতে পারে না। **হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ মাওউদ (আঃ) যদি হযরত আকদস মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী প্রেরিত হয়ে থাকেন, যেমন কিনা আমরা দৃঢ়বিশ্বাস রাখি যে, অবিকল তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী-ই তিনি আবির্ভূত হয়েছেন, তাহলে তাঁকে অস্বীকার করা (প্রকৃতপক্ষে) আঁ হযরত (সাঃ)-এর বাণী ও নির্দেশকেই অস্বীকার করার নামান্তর।** এবং এই অস্বীকারের ফলশ্রুতিতে খোদাতাআলা যেসব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করে থাকেন, উল্লেখিত আয়াতগুলোতে তাই-ই তিনি বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, "কুল হুয়াল কাদিরু আলা আঁই ইয়াব্আসা আলায়কুম আযাবাম মিন ফাওকিকুম আও মিন তাহ্তি আর্জুলিকুম"-তাদের বলে দাও যে, আল্লাহ্তাআলা তোমাদের মাথার উপর দিয়েও আযাব আনয়নে অথবা তোমাদের পায়ের নীচে দিয়েও আযাব প্রকাশে সর্বসক্ষম, "আও ইউলবিসাকুম শেয়াআওঁওয়া ইউযীকা বা'যাকুম বা'সা বা'যা"- অথবা তোমাদেরকে দলে-উপদলে বিভক্ত করে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত করতে এবং তোমাদেরকে একে অন্যের আক্রমণের স্বাদ গ্রহণ করাতে। "উনযুর কায়ফা নুসার্রেফুল আয়াতি লাআল্লাহু ইয়াফ্কাহুন"- দেখ, কীরূপে আমরা (আল্লাহ্) এই দলিল-প্রমাণ ও নিদর্শনসমূহ বিভিন্ন প্রকারে বিশদভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে এরা বুঝতে পারে। "ওয়া কায্যাবা বিহি ক্বওমুকা ওয়া হুয়াল হাক্কু"- আর তোমার জাতি ইহাকে প্রত্যাখ্যান করেছে অথচ তা নির্ঘাৎ সত্য। "কুল লাস্তু আলায়কুম বে-ওয়াকীল"- বলে দাও, আমি তোমাদের উপর তত্ত্বধায়ক নই। আল্লাহ্র তক্দীর যা ফয়সালা করতে চায়, তা-ই সংগঠিত হবে এবং তাতে কোনও হস্তক্ষেপ করার অধিকার বা ক্ষমতা আমার নেই। ঐ তক্দীরের হাত থেকে আমি বা অন্য কেউ-ই রক্ষা করতে পারে না। 'লাস্তু আলায়কুম বি-ওয়াকীল'-তোমাদের কর্মফলের জন্য তোমরা নিজেরাই দায়বদ্ধ। তোমরা তোমাদের কর্মের শাস্তি ভোগ করবে, সেজন্যে তখন আমাকে দায়ী করতে পারবে না।" কিন্তু পূর্ববর্তী অন্যান্য জাতির মত এই জাতিটিরও স্বভাব দাঁড়িয়েছে যে, নিজেদের পাপাচারের কুফলকে তারা অন্যের উপর চাপাবার চেষ্টা চালায়। নিজেদের কার্যকলাপের দায়ভার নিজেরা গ্রহণ ও বহন করার পরিবর্তে অন্য কারও ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়।

বিগত জুমুআর খুৎবায় আমি খোলাসা ক'রে ঘোষণা করেছিলাম যে, ঐ দেশের আইন ও সংবিধান, যা রদ্দি হয়ে গেছে, তা হয়তো তারা নিজেরা ছিঁড়ে ফেলে দেবে, নয়তো তাদের অনাচারজনিত সঙ্কটের দ্রুতবর্ধিষ্ণু পানি যদি ওটাকে নিমজ্জিত করতে না পারে, তাহলে এই আইন ও সংবিধান স্বয়ং এতো নোংরা ও ময়লা যে ওটাই এ দেশটিকে নিমজ্জিত করতে পারে। এটা (আমার পক্ষ থেকে) একটি সতর্কবাণীস্বরূপ ছিল এবং সম্পূর্ণ সঠিক সতর্কবাণী ছিল। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে, হুবহু সে-কথাটি-ই সমস্ত জাতির সকল মহল থেকে উচ্চারিত হয়েছে। পক্ষান্তরে মোল্লারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী সারা দেশ ব্যাপী এই বলে হৈ চৈ শুরু করেছে যে, মির্যা তাহের আহ্মদ পাকিস্তানের সাংবিধানিক এই সঙ্কটে নিজের যোগসাজশ স্বীকার

করে নিয়েছেন এবং এই গোটা সঙ্কটটি কাদিয়ানীদের সৃষ্ট। এলোকগুলো কতো যে আহাম্মক! একটু ভেবে দেখুক বলছে কী তারা! এই সঙ্কটটিতে কারা কারা লিপ্ত ছিল? এক নেওয়াজ শরীফ। দুই, রাষ্ট্রপতি লেগারী। তিন, সাজ্জাদ সাহেব, যিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ছিলেন এবং যিনি দাবী করে বলছেন যে, এখনও তিনি আছেন, তেমনি সুপ্রীমকোর্টের অন্যান্য সকল বিচারপতি এবং অন্যান্য প্রাদেশিক বিচার-বিভাগের প্রধান বিচারপতিগণ–এই সবগুলো লোক এই সাংবিধানিক সংকটে জড়িত। যদি দাবী করা হয় যে, সংকট কাদিয়ানীরা সৃষ্টি করেছে, তাহলে উল্লেখিত সবার বিরুদ্ধেই মকদ্দমা হওয়া উচিত। আদালতের কাঠগড়ায় এদের প্রত্যেকের দাঁড়ান উচিত। এবং তাদের প্রত্যেককে এই প্রশ্ন করা উচিত, যেমন "কি জনাব নেওয়াজ শরীফ সাহেব! কাদিয়ানীরা যখন আপনাকে জড়িত করেছিল তখন আপনি জড়িত হলেন কেন? কিছু তো বিবেক বুদ্ধি খাটানো উচিত ছিল আপনার। কাদিয়ানীরা আপনাকে উস্কানি দিচ্ছিল, আর আপনি কিনা তাতে ফেঁসে গেলেন? ছি, ছি,- ওমনি গিয়ে হস্তক্ষেপ করতে আরম্ভ করলেন এবং সুপ্রীম কোর্টের ঐ সংকটে ঝাঁপিয়ে পড়লেন? তেমনি বিচারপতি সাজ্জাদ শাহ্‌কে প্রশ করা উচিত, "প্রধান বিচারপতি বনে বেড়ান অথচ আল্লাহ্ কি আপনাকে এতটুকু আক্কেল-বুদ্ধি দেন নি,যাতে আপনি কাদিয়ানীদের কথায় এই সংকটে জড়িয়ে না পড়তেন? তারপর, বাকী সব বিচারপতিদের এমনি ক'রে ধরা উচিত ছিল। আর ফারুক লেগারী সাহেবকে বিশেষ ভাবে ধরা উচিত। কেননা, লেগারী সাহেব হুবহু এ কথা বলেছেন যে, সাম্প্রতিক সঙ্কট কাদিয়ানীরা তাদের উপর চাপিয়ে দিয়েছে। বস্তুতঃ এর প্রথম ও প্রধান ভূমিকাপালনকারী তো হচ্ছেন লেগারী সাহেব স্বয়ং। সমস্ত উত্তেজনা তাঁরই চারদিকে ঘুরপাঁক খাচ্ছে। কাযী হুসেন আহ্‌মদ (পাকিস্তানের জামাত ইসলামীর আমীর) এবং লেগারী সাহেব দু'জনেই পরস্পর মিলে গেলেন। আল্লাহ্ তাদেরকে জোড়া বানিয়ে দিলেন। কাজেই এ দু'জনকে জিজ্ঞেস তো করা হোক, "কাদিয়ানীরা যখন আপনাদের বলেছিল, তখন আপনারা অস্বীকার করলেন না কেন? কাদিয়ানীদের কথায় লাগাম-ছাড়াই দৌড় দিলেন?" এই হচ্ছে তাদের নির্বুদ্ধিতার হাল-হকীকত। প্রকৃতপক্ষে মৌলবীরা হাড়ে-হাড়ে বুঝে গেছে যে, পাকিস্তানের এই আইন ও সংবিধান ভেঙ্গে পড়ছে। যদি কার্যতও ভেঙ্গে যায়, তাহলে আহ্‌মদীদের সংক্রান্ত সংশোধনীমূলক দফাটিও সেই সাথে বেরিয়ে যাবে, বাতিল হয়ে যাবে। তাই হঠাৎ জেগে উঠে তারা ভাবছে, এ সব কী ঘটছে। সুতরাং তারা সবাই এ ব্যাপারটিতে একজোট হয়ে ঘোষণা করছে যে, তারা ঐক্যবদ্ধ হবে এবং এটা (অর্থাৎ তাদের তথাকথিত এই ঐক্য) প্রকারান্তরে রাজনৈতিক নেতাদের এবং বুদ্ধিজীবীদের প্রতি যেন হুমকি বা সতর্কবাণীস্বরূপ হয় এই বলে যে, "দেখুন! আপনারা আহ্‌মদীদের সংক্রান্ত দফাটিতে হাত দেবেন না। নইলে, আমরা ফাসাদ ও দাঙ্গা বাঁধাবো।" আর এই বোকারা এ কথাটি ভুলে গেল যে, আসলে ষড়যন্ত্রটি তো কাযী হুসেন আহ্‌মদ এবং লেগারী সাহেবের সৃষ্ট। যদি এই ব্যাপারটিতে ফাসাদ সৃষ্টি হয়, তাহলে নেতৃত্ব এদের হাতে আসবে। এবং সমস্ত মৌলবী বেকুব বনে যাবে এই দেখে যে, যদি সব মোল্লা মিলিত হয়ে লাফায়, তাহলে এ লাফানোর ফলে উল্লেখিত দু'জনই ওপরে ভেসে উঠবে, লাভবান হবে। অদ্ভূত ধরনের এই জাতি, যাদের সম্মুখে ঘটমান বিষয়গুলোও তাদের চোখে ধরা পড়ে না, দেখেও তারা কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। বস্তুতঃ সব দিকেই নির্বুদ্ধিতার ছড়াছড়ি।

আমার ঘোষণাটিতে যে কথাগুলো ছিল তার একটি তো আগেই বলে এসেছি বাকীটুকু হচ্ছেঃ **"আহ্‌মদীদেরকে অ-মুসলিম ঘোষণা করার আইনটি যদি বাতিল না হয় তাহলে দেশ বাতিল হয়ে যাবে অথবা এই আইন দেশকে ডোবাবে। যদি অদ্রূপ না হয়, তাহলে পাকিস্তানে পাপাচার ও অনাচারের কলুষিত পানি শেষমেষ সুপ্রীম কোর্টেরও ভরাডুবি ঘটাবে।"** এই ছিল আমার ঘোষণাটি। এর মোকাবেলায় সেখানকারই নিম্নরূপ একটি ঘোষণাও শ্রবণ করুন। সরদার ইব্রাহীম বলেন ঃ "জাস্টিস সাজ্জাদ ফারুক লেগারীকেও নিয়ে ডুবেছেন।" একথাটি তো আমার বক্তব্যটিতে পাঠ করে এসেছি। আরও অনেকের বক্তব্যের মধ্যে "সঙ্গে নিয়ে ডোবার" কথাটি এসেছে। আর যারা হৈ চৈ করছে তারা ঘোষণা করছে, আসল কথা প্রকাশ পেয়েছে যে, বিচার বিভাগ, সংসদ এবং রাষ্ট্রপতিকে একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত করার কাজটি সংঘটিত হয়েছে কাদিয়ানীদের যোগসাজসে"। তাদের একথার অর্থ দাঁড়াচ্ছে যে, বিচারপতিগণ ও সাংসদগণ এবং রাষ্ট্রপতি এই সবাই এতো আহাম্মক যে, কাদিয়ানীদের কথা শুনে তারা একে অন্যের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়েন। অতএব, যারা বিবাদে লিপ্ত হয়েছে তাদের ধরো, তাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চালাও রাষ্ট্রদ্রোহী তো তারা, যারা আমাদের কথায় পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়েছে। লণ্ডনে বসে থেকে আমি কি ক'রে বিদ্রোহী হলাম? যারা পাকিস্তানে অবস্থান করে একে অন্যের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে এবং দেশের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের গ্রেফতার করো।

মৌলানা আমজাদ বলেছেন, "আইন বাতিল করবার ষড়যন্ত্র চলছে। মির্যা তাহের আহ্‌মদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার মকদ্দমা করে তাকে এখানে ফিরিয়ে আনা হোক।" আমাকে যখন ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তখন দেখা যাবে কী হয়, কিন্তু ওখানে যারা আছেন তাদেরকে তো আগে পাকড়াও করুন। তাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতা ও বিশ্বাসঘাতকতার মোকদ্দমা তো রুজু করুন। তারপর আরও শুনুন। বলা হয়েছেঃ "সাংবিধানিক সংকট কাদিয়ানীরা সৃষ্টি করেছে। লেগারী ও মাওলানা নূরানীর পরস্পর সাক্ষাতে ঐকমত্য রয়েছে।" তার মানে এই ঐকমত্যে লেগারী সাহেব শামিল রয়েছেন। কী অদ্ভূত ধরনের তাঁর ব্যক্তিত্ব! তিনি রাষ্ট্রপতি হয়ে সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের ঝড় বইয়ে দিলেন! অবশেষে এই বিবাদ তাকে ডোবালো। সেই সঙ্গে কাযী হোসেন আহ্‌মদকেও ডুবিয়ে দিলো। আর শেষে সবাই মিলিত হয়ে তারা এই বয়ান জারী করলেন যে, সাংবিধানিক যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল ওটা ছিল কাদিয়ানীদেরই ষড়যন্ত্র।

জাস্টিস রফিক তারার সাহেব বলেছেন, "সাম্প্রতিক সাংবিধানিক সঙ্কটের পেছনে ছিল কাদিয়ানীরা। এই খেলার

ব্যর্থতায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে মির্যা তাহের আহ্‌মদ এবং তাঁর জামাতের। মুরীদানের মাঝেও ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে।" সুবহানাল্লাহ! সীমাতিরিক্ত আহাম্মকসূলভ এই উক্তিটি! রফিক তারার সাহেব ছিলেন বিচারপতি। তারই মেধার এই দৈন্যদশা! তিনি বলছেন, "সবচে' বেশী ক্ষতি মির্যা তাহের এবং তার জামাতের হয়েছে।" যদি কাদিয়ানী জামাতের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে তাহলে তারা পাকিস্তানের সাংবিধানিক সঙ্কটের ষড়যন্ত্রে কি ক'রে লিপ্ত হলো? কিন্তু তিনি বোঝাতে চান যে, সঙ্কট সৃষ্টিতে আমার ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে সেজন্য ক্ষতি সাধিত হয়েছে। অথচ ক্ষতির জন্য তো গোটা দেশবাসী কান্নাকাটি করছে, এজন্য যে, এই সঙ্কটে দেশের ক্ষতি হয়েছে। আর আমি ঐ দেশটির স্বপক্ষে দোয়ার জন্য ঘোষণা করেছিলাম, সমগ্র আহ্‌মদীয়া জামাত যেন দোয়া করে, যাতে দেশের ক্ষতি না হয়, বরং ক্ষতি হলে ঐ বেহুদা আইন ও সংবিধানের ক্ষতিসাধিত হোক, যে আইন ও সংবিধান দেশটিকে ডুবিয়ে দিচ্ছে। তারপর রাজা জাফরুল হাসান সাহেবের বিবৃতি হচ্ছেঃ "আইনকে বাতিল করার জন্য ষড়যন্ত্র তুঙ্গে উঠেছে। মির্যা তাহেরের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করা হোক। ইহা সঠিক বলেই প্রতীয়মান হয় যে, কাদিয়ানীরা দেশটিকে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।"

তারপর দেশের বিরুদ্ধে মির্যা তাহেরের বিদ্রোহ ঘোষণার উল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ তাঁর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হোক। কাদিয়ানীদের তৎপরতার নোটিশ নিয়ে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। এ বিবৃতিটি হচ্ছে আতাউল্লাহ্ শাহ বোখারীর পুত্র কর্তৃক জারীকৃত। এ-গুলো হচ্ছে ঐ সব অভিযোগ যা আমার বা আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে উত্থাপিত হচ্ছে। এখন ঐ দেশটির যে হাল-অবস্থা সে-দেশের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে, তা থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। সুতরাং রফিক বাজওয়া সাহেব বলেছেনঃ

"আইন ও সংবিধান বিতর্কিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অতএব, সংবিধানে সংশোধনীগুলোকে বাতিল করা হোক। বস্তুতঃ ১৯৭৩-এর সংবিধানটিই হচ্ছে উত্তম।"

এ কথাটিইতো আমি বলেছিলাম যে, ১৯৭৩-এর সংবিধানে যে-সব সংশোধনী পরবর্তীতে সংযোজন করা হয়েছে ঐ সবগুলো বাতিল করা হোক। তবেই কিনা তোমাদের রক্ষা পাবার কোন উপায় সম্ভবপর হতে পারে। উল্লেখিত বিবৃতিদাতা (রফিক বাজওয়া) আহমদীয়া জামাতের ঘোর বিরোধী বলেই পরিচিত। যিনি প্রকাশ্যে অনেক বিরোধিতা করেছেন স্বয়ং তিনিও এখন ঘোষণা করছেন, **"সংশোধনীগুলোকে বাতিল করা হোক। ১৯৭৩-এর সংবিধানই হচ্ছে উত্তম।** ৭৩-এর সংবিধান কি ব্যর্থ বলে কখনও ঘোষণা করা হয়েছে?" এ বিষয়ে আরও অনেক বুদ্ধিজীবী ও চিন্তাবিদের বক্তব্য ও অভিমত রয়েছে। যেমন ডঃ বাসেত সাহেব বলেন ঃ "দেশটিতে এখন কোন আইন (সংবিধান) মজুদ নেই। যদি ধরে নেয়া হয় যে, ১৯৭৩-এর আইন মজুদ রয়েছে, তাহলে উহাও বর্তমানে পরিস্থিতির সাথে খাপ খায় না। প্রকৃতপক্ষে নতুন আইনের আবশ্যক।"

যদি আমি বলি যে, নতুন আইনের আবশ্যক, তখন বলা হয় যে, ইনি রাষ্ট্রদ্রোহী। অথচ সে-কথাটি গোটা দেশবাসী বলছে, তথাপি কোন একটিও মোকদ্দমা রুজু করা হচ্ছে না! পুনরায় রফিক বাজওয়া সাহেবের বিবৃতি হচ্ছেঃ "দেশের বর্তমান আইন স্ব-বিরোধপূর্ণ এবং এতে রয়েছে গভীর চিন্তা-ভাবনা ও শ্রদ্ধাবোধের অভাব। ১৯৭৩-এর আইনটি ছিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত আইন; কিন্তু পরবর্তীকালের শাসকবর্গ নিজেদের ক্ষমতাকে কুক্ষিগত ও দীর্ঘায়িত করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থে উহার মধ্যে বিভিন্ন সংশোধনী আনয়ন করেন, যদ্দরুন সংবিধানটি বিতর্কিত (বিসংবাদিত) বিষয়ে পরিণত হয়।"

অবিকল উক্ত কথাগুলোই আমিও বলেছি, কিন্তু দেখুন, তারা বলছে, "তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন।" এটা সর্বৈব মিথ্যা অপবাদ। আমার বক্তব্যের কোথাও লেশমাত্রও কোন বিদ্রোহের ঘোষণা নেই। কিন্তু খোলাখুলিভাবে যারা বিদ্রোহের ঘোষণা করছে, তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না! সুতরাং মাওলানা ফয্‌লুর রহমান বলেছেনঃ "একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে যে, এখন জাতির মধ্য থেকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠে আসা আন্দোলনকে (অন্যকথায়, বিদ্রোহাত্মক তৎপরতাকে) সুসংহত ও সংগঠিত ক'রে দেশের সাংবিধানিক এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন চালিয়ে এই সংবিধানকে যেন সমূলে উৎপাটিত করা হয়।" আমি তো বলেছিলাম যে, কোনকিছু ক্ষতি করলে তা এই আইন দেশের ক্ষতি করছে। কেননা, এই আইন যেহেতু ভ্রান্ত ও ভ্রমাত্মক, সেহেতু যা কিছু ক্ষতি সাধিত হবে তা এই আইনের দরুনই হবে। পক্ষান্তরে, তারা বলছেন যে, সারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ (বাস্তবায়িত করা) অবধারিত হয়ে পড়েছে?। পাকিস্তানে বসে একজন মোল্লা এই বিবৃতি দিচ্ছে। কারও সাহস নেই যে, তাকে রোধ করে। যরিনা ভুট্টো সাহেবা লিখেছেন ঃ "সংবিধান পাল্টানো ব্যতিরেকে দেশ এখন সঙ্কট-মুক্ত হতে পারে না।"

মাসিক 'খবরনোমায়ী'-এর সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতির বিস্তারিত বিবরণ এবং তদপরিপ্রেক্ষিতে বহু প্রস্তাব ও পরামর্শ উপস্থাপনের পর যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে হুবহু ঐ সব সিদ্ধান্তই পেশ করা হয়েছে যা আমি বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আহরণ করেছি। কেবল 'হুবহু' বলাই সঠিক হবে না, বরং তাথেকে অনেক বেশী তারা বেড়ে গেছেন এবং দেশের ভেতরে অবস্থান করে তারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের বর্তমান সংবিধানকে রদ্দি কাগজের টুকরো বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্যান্যদের মতন একই ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন– যেমন "এই সঙ্কট অমুককেও ডুবিয়েছে, তমুককেও নিমজ্জিত করেছে। সুপ্রীম কোর্টকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে এবং রাষ্ট্রপতিকেও। তাছাড়া কারও কোন আইনানুগ অবস্থান অবশিষ্ট থেকে যায় নি।" প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব কিছুই কি আমরা এখানে বসে এই জাতি দ্বারা কার্যকরী করিয়েছি? যদি সমগ্র জাতি এরূপ উন্মাদে পরিণত হয়ে থাকে যে, এখানে বসা অবস্থায় আমার কথা ও নির্দেশ অনুযায়ী তারা সঙ্কটের পর সঙ্কটের শিকার হয়ে পড়ছে, তাহলে সমগ্র জাতিকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিয়ে দেয়া উচিত। কিন্তু আমি তা করতে বলি না। বরং মোল্লারা এই কথা বলছে। আমার

মতে বর্তমান চলমান পরিস্থিতির উপর সুস্থ-সঠিক সমালোচনা ও পর্যালোচনা করা কোনও অপরাধ নয়। সে দিক থেকে সমগ্র জাতি সম্পূর্ণ যথার্থ মূল্যায়নই করছে। অতএব, ইহা কোন প্রকার বিদ্রোহ নয়।

সাবেক আইনমন্ত্রী এম, মাসূদ সাহেব বলেছেনঃ "১৯৭৩-এর সংবিধান দেশের সকল প্রয়োজনকেই পূরণ করে। এই সংবিধানে সংশোধনীসমূহ আনয়ন ক'রে এর চেহারা-সূরত বিকৃত করে ফেলা হয়েছে"।

আবার সেই মোল্লা ফযলুর রহমান সাহেব বলছেনঃ "দেশ আইনবিহীন অবস্থায় হয়ে পড়েছে। সংবিধান বহির্ভূত সকল পদক্ষেপই গৃহীত হয়েছে।" এখন দেখুন, যে দেশ আইনবিহীন হয়ে পড়েছে উহার আইন সম্পর্কে আমি যদি সমালোচনা করি তাহলে উহা তাদের দৃষ্টিতে বিদ্রোহ বলে বিবেচিত হয়! অতঃপর তিনি বলেছেন, যেহেতু সংবিধান বহির্ভূত সকল পদক্ষেপই গৃহীত হয়েছে এবং দেশ আইনবিহীন হয়ে পড়েছে, সেহেতু দেশের বিরুদ্ধে এখন বিদ্রোহ কার্যকর করা উচিত"। সারা দেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাকারীকে তো কেউ গ্রেপ্তার করে না!

কমোডোর তারেক মজীদ সাহেব লিখেছেনঃ "এখন আইনের **সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়া হয়েছে। এতো সংবিধান লঙঘন করা হয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এই সংবিধান এখন এমন হয়ে পড়েছে, যেমন রদ্দি কোন কাগজের টুকরা। এমন হয়ে পড়েছে, যেমন রদ্দি কোন কাগজের টুকরা হয়ে থাকে"**। রদ্দি কাগজের কোন টুকরা ওরূপ কোন কথা আমি কখনও বলেছি বলে তো আমার মনে পড়ে না। কিন্তু যদি বলেও থাকি বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে এখন ঐ দেশের চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবীরাও তাই বলছেন যে, রদ্দি কাগজের টুকরার সমানও এখন সেখানকার সংবিধানের মূল্য নেই। ইউকে-এর সুলতান সোহ্‌রাওর্দি সাহেব লিখেছেনঃ

"সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি সাজ্জাদ আলী শাহ্ সম্পর্কে কোয়েটা বেঞ্চের ফয়সালা ঘোষণার পর এ কথা বলা যে, সংবিধান এখনও বহাল ও অক্ষুণ্ন আছে, তা মুনাফাফাত (কপটতা) ব্যতীত অন্য কিছু নয়।" অতএব, সমগ্র এই জাতি এখন মিথ্যাচার, কপটতা ও স্ববিরোধের শিকার হয়ে পড়েছে।

অতএব, যে আইন ও সংবিধান এখনও দেশের উপর চাপিয়ে রাখার উপযুক্তই নয় সে আইন ও সংবিধান অপসারণের মধ্যেই এখন দেশের মুক্তি নিহিত।

এতো ছিল আইন ও সংবিধান সম্পর্কে বক্তব্য। এখন আমি এই জাতিকে পুনরায় সতর্ক করতে চাই এই বলে যে, হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন ক'রে কুরআন করীমের উল্লেখিত আয়াতসমূহে যা কিছু বলা হয়েছে, অবিকল তা-ই আপনাদের ক্ষেত্রে সংঘটিত হচ্ছে এবং আরও হবে। যদি কোন-কিছু আপনাদের রক্ষা করতে পারে, তা আপনাদের পরস্পরের মধ্যে চলমান কপটতা ও বিবাদ বিসম্বাদ নয়, বরং একমাত্র আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের সম্মিলিত দোয়া-ই আপনাদের রক্ষা করতে সক্ষম। যারা রক্ষাকারী তাদেরকে আপনারা নিজেদের শত্রু বলে ধরে নিয়েছেন। যাদের দোয়া আল্লাহ্‌তাআলার দরবারে গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিতে অবলোকন করা হয়, তাদেরকে আপনারা নিজেদের শত্রু ভেবে বসে আছেন! বস্তুতঃ আপনারা তো দোয়ার বিষয়-বস্তু সম্পর্কেই সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কেবল চিল্লানো ও চিৎকার করা এবং একে অন্যকে গালমন্দ করা, একে অন্যেকে আঘাত করা এ সবই আপনাদের নিত্যকার স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। **সেজন্য এই দেশটি থেকে হতভাগা মোল্লাকে বহিষ্কৃত করুন। এরা আপনাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসে আছে। এরাই সব রকম সঙ্কটের উদ্ভব ঘটায়। ভবিষ্যতে যদি আরও কোন সঙ্কটের সৃষ্টি হয় তাহলে এই মোল্লারাই তা সৃষ্টির কারণ সাব্যস্ত হবে। অতএব, আপনারা প্রকৃত শত্রুকে সনাক্ত করুন এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটান।** যদি কোন উপায়ে মোল্লাতন্ত্রের অবসান ঘটাতে পারেন, তাহলে এই দেশটি বিশ্বের একটি মহান দেশ বলে পরিগণিত হবে। ইহা এরূপ এক বাস্তব সত্য, যা কেউ খণ্ডন করতে সক্ষম নয়। ইহা এরূপ এক সত্যের অভিব্যক্তি, যার উপর কোন রকম হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়। আপনারা এখন এর বিরুদ্ধে যতো ইচ্ছা হৈ চৈ ও চিৎকার করুন না কেন, তথাপি আপনারা নিজেদের হৃদয়-পটে লিখে নিন যে, **এই দেশ থেকে যদি মোল্লা সৃষ্ট বিপর্যয় দূর করে দেয়া হয় এবং তাদেরকে রাষ্ট্রীয় সকল বিষয় থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরিয়ে দেয়া হয়, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলার অপার অনুগ্রহে পাকিস্তানের উপর এরূপ রহমত-ধারা বর্ষিত হবে, যার ফলে ইহা একটি মহান দেশে পরিণত হতে পারে। অতএব আমাদের এই হচ্ছে কামনা এবং এই দোয়া। আপনারা আমার এই ঘোষণা সম্পর্কে যে-ভাবে যতো ইচ্ছা বিকৃত আকারে বলতে বা কার্যকলাপে লিপ্ত হতে থাকুন না কেন তা সবই আপনাদের বিরুদ্ধে যাবে। কেননা, সর্বশক্তিমানের উপর আমাদের অটল-অবিচল বিশ্বাস রয়েছে। আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্‌তাআলার সাহায্য-সহায়তা আমাদের সঙ্গে আছে এবং তিনি আমাদের অন্তরের আহাযারী ও আকুতি-মিনতিকে শ্রবণ করে থাকেন।** আর যদি তিনি তোমাদের অশ্লীল প্রলাপকে শোনেনও, তাহলে তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই শুনে থাকেন, তোমাদের অশ্লীল প্রলাপ তোমাদের বিরুদ্ধে পাল্টে দেয়ার জন্য শ্রবণ করে থাকেন। পক্ষান্তরে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পৃষ্ঠপোষকতায় আমাদের খোদা সদা দণ্ডায়মান রয়েছেন এবং সর্বদা থাকবেন। এই তকদীরকে পরিবর্তন করার কারও সাধ্য নেই।

এখন আমি সাবেক ধারাবাহিক বিষয়-বস্তুর অবতারণার আগে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহ্‌মদ সাহেবের ইন্তেকাল প্রসঙ্গে কয়েকটি বিষয় বর্ণনা করতে চাই। তাঁর জীবন বৃত্তান্ত আল্ ফযলেও প্রকাশিত হয়েছে। তা ছাড়া বিভিন্ন জামাতের পক্ষ থেকে তাঁর ইন্তেকালের উপর সদর আঞ্জুমানের গৃহীত শোক প্রস্তাবের আকারেও বিস্তার লাভ করেছে। ঐ সব বিস্তারিত বিবরণে যেতে চাই না, যা আগেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু আমি জানাতে চাই যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ইল্‌হাম (-ঐশী বাণী) ছিল, যা হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের (রাঃ) উপর প্রয়োগ করা হয়। তবে আমি একমাত্র ব্যক্তি, হয়তো বা আরও কেউ থাকতে পারেন -তবে সূচনা থেকেই আমি এই দৃঢ়-বিশ্বাস পোষণ করতাম যে, সংশ্লিষ্ট

ইলহামসমূহ প্রকৃতপক্ষে তাঁর পুত্র সাবেযাদা মির্যা মনসুর আহ্‌মদ সাহেবের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইহা বাস্তব সত্য যে, কোন কোন ভবিষ্যদ্বাণী যেমন কিনা রসূলল্লাহ্ (সাঃ)-এর সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল – ভবিষ্যদ্বাণী কোন একজন ব্যক্তি সম্পর্কে করা হয়, কিন্তু (তার স্থলে) তার পুত্রকে বুঝায়। ঐ সব ইলহাম, যা আমি সবিস্তারে বর্ণনা করবো, সেগুলো সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে, প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঐ সকল ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ইলহাম হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের পুত্রের ক্ষেত্রে ও আকারে বাস্তবায়িত হওয়া নির্ধারিত ছিল। এ বিষয়টি আমি বহুবার হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসুর আহ্‌মদ সাহেবের কাছে বর্ণনা করি। কিন্তু ওটা আমাদের দু'জনের মধ্যে একটি ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল। শুরুতে তো – তাঁর যেমন অত্যন্ত বিনয়ের স্বভাব ছিল, তিনি আমার অভিমত গ্রহণে সংকোচ বোধ করেন। অর্থাৎ শোনার পর নীরব থাকতেন। আমি সে সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে থাকি। আমি বলি যে, ঐ ইলহামগুলিতে আপনাকে বোঝায় না তা কখনও হতেই পারে না। তারপর, অবশেষে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হন। কমপক্ষে তিনিও যে ইলহামসমূহের আওতায় পড়েন বা আছেন সেজন্য তিনি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ ছিলেন। এখন ঐ সকল ইলহাম শ্রবণ করুন। ১৯০৭ সনের ঘটনা। হযরত মসীহ্ মাওউদ লিখেছেনঃ "শরীফ আহমদ সম্পর্কে তাঁর অসুস্থ থাকাকালে (আমার উপর) এই ইলহাম অবতীর্ণ হলোঃ আম্মারাহুল্লাহুতাআলা আলা খিলাফিত্‌তাওয়াক্কো।" অর্থাৎ আল্লাহ্ তাকে সুদীর্ঘ আয়ু দান করেছেন "আলা খিলাফিত্‌তাওয়াক্কো" – অপ্রত্যাশিতভাবে – যার অর্থ হচ্ছে, সাধারণভাবে মানুষের যা আয়ুষ্কাল হয়ে থাকে তার চেয়ে অতিরিক্ত। এরদ্বারা ইহা বুঝায় যে, এরূপ অবস্থার উদ্ভব হতে থাকবে যার দরুন আগেই মারা যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌তাআলা উহার পর অপ্রত্যাশিতভাবে তাকে বার বার বাঁচিয়ে রাখবেন। তারপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) তাঁর সম্পর্কে আরও বলেন যে, ঐ ইলাহামটি এভাবেও নাযেল হয়েছেঃ "আম্মারাহুল্লাহুতাআলা আলা খিলাফিত্‌তাওয়াক্কো" (প্রথম ইলহামটিতে "আম্মারা" শব্দটির প্রথম অক্ষরটি হচ্ছে আইন, যার অর্থ আয়ুবৃদ্ধি করা এবং দ্বিতীয়টিতে এ শব্দটির প্রথম অক্ষর হচ্ছে আলিফ – যার অর্থ হচ্ছে, তাকে ইমারত দান করলেন – অনুবাদক)। অর্থাৎ – আল্লাহ্ তাকে ইমারতের অধিকারী করবেন বা আমীর বানাবেন এবং তার এই আমীর হওয়া অপ্রত্যাশিত হবে অর্থাৎ এতো দীর্ঘকাল যাবৎ এই ব্যক্তিকে আমীর বানানো হবে যে, তা অপ্রত্যাশিত ছিল। এ সকল ইলহামের যে সব তরজমা 'তাযকিরা' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে– সে-সম্পর্কে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ঐ তরজমা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) করেন নি। কেননা, যারাই তা করেছেন, তারা তা প্রকৃতপক্ষে বাস্তব ঘটনার পরিপন্থী তরজমা করেছিলেন। ওরূপ তরজমা আসলে হতে পারে না। ওটাকে আমি বাস্তবতা বিরোধী বলে মনে করি। আমার মনে হয় ওলামা ঐ তরজমাটি করেছেন এই আকাঙ্খার বশবর্তিতায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীটিকে যাতে হযরত সাহেবযাদা মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের উপর প্রয়োগ করা যায়। তাযকিরার টীকায় ঐশী বাণীটির তরজমা করা হয়েছেঃ "উস্‌কো ইয়ানি মির্যা শরীফ আহ্‌মদকো খোদাতা'আলা উম্মীদসে বাড়্ কার্ আমীর করেগা" – (তাকে অর্থাৎ মির্যা শরীফ আহ্‌মদকে আশাতীতভাবে ধনী করবেন) অর্থাৎ ধন-সম্পদ দান করবেন। কিন্তু 'আম্মারাহুল্লাহু' এর অর্থ এ নয় যে, তাঁকে আল্লাহ্ ধনী বানাবেন। বরং এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ্ তাকে ইমারতের অধিকারী অর্থাৎ আমীর বানাবেন। বস্তুতঃ আরেকটি ইলহামের দ্বারা অবিকল তা-ই প্রমাণিত হয়। সুতরাং বলা হয়েছে যে, "উওহ্ বাদশাহ্ আয়া" – (ঐ যে বাদশা এসেছেন')। এ ইল্‌হামটির ব্যাখ্যায় তিনি (আঃ) বলেন যে, "তাঁর সম্পর্কে আরেকটি ইলহামে তাকে 'কাযী' বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ তাকে প্রশাসনিক ক্ষমতার অধিকারী করা হবে। যেহেতু অন্যান্য ইল্‌হামের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কর্তৃক নিজেরই পেশকৃত ব্যাখ্যা তায্‌কিরার টীকায় লিপিবদ্ধ তরজমাকে ভ্রান্ত সাব্যস্ত করছে, সেজন্য আমি যখন ওলামার কাছে এ সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে তথ্যানুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানালাম, তখন মৌলবী দোস্ত মুহাম্মদ সাহেব, যিনি মাশাআল্লাহ্ এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তিনি লিখেছেন যে, "এই সব তরজমা নিঃসন্দেহে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর তরজমা নয়। সাহেবযাদা মির্যা বশীর আহ্‌মদ সাহেব (রাঃ) ১৯৩৫ সালে 'তায্‌কিরা'র প্রকাশনার সময়ে যে নোট লিখেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টতঃ বর্ণনা করেছেন যে, "ঐ সমস্ত তরজমা যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) নিজে করেছিলেন ঐ সবটাই মূল গ্রন্থাংশের (বা মূলপাঠের) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তা পাদ-টীকার অন্তর্ভুক্ত হয় নি। পাদ-টীকায় লিপিবদ্ধ তরজমা পরবর্তীতে ওলামা করেছেন। কাজেই এই যে আমার মনে সন্দেহ ছিল, বরং একীন ছিল যে, তা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) কৃত তরজমা হতেই পারে না– এ প্রসঙ্গে আমি রাবওয়া থেকে অনুসন্ধান করিয়েছি যে, আমার মনে বদ্ধমূল ধারণাটিই সঠিক ছিল। প্রকৃতপক্ষে যে-তরজমাটি ওলামা করেছিলেন তা যদি মেনে নেয়া হয়, তাহলে দেখা যায় যে, হযরত মির্যা শরীফ আহ্‌মদ সাহেবের আয়ুষ্কাল তো সুদীর্ঘ ছিল না। তাঁর ভ্রাতাদের চেয়ে কম বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে ঐ স্বল্প আয়ুষ্কালটিকেও অপ্রত্যাশিত (–'খিলাফে তাওয়াক্কো') বলা আকাঙ্খার বহির্প্রকাশ তো বটে, কিন্তু ঘটনার অভিব্যক্তি নয়। তাছাড়া, তাঁর উপর 'ইমারত' কখনও সোপর্দ করা হয় নি। আমার স্মরণ পড়ে না। হয়তো বা কখনও তাঁকে আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল, তা সন্দেহাতীত নয়। তিনি সাধারণতঃ আমীর হিসেবে নিযুক্ত হতেন না। সেজন্যই আমি উল্লেখিত দু'টি ইল্‌হামকে হযরত মির্যা মনসূর আহ্‌মদ সাহেব সম্পর্কেই মনে করতাম। কেননা, তাঁর বয়ঃসীমা এর সাক্ষ্য বহন করে। এতো উপর্যোপরি তাঁর হার্ট এট্যাক হয়েছে যে, প্রত্যেকবারই ডাক্তারগণ বলেছেন যে, তাঁর আর বেঁচে থাকার আশা নেই। তার পরই আবার আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে আরোগ্য করে দিতেন। সবাই অবাক বিস্ময়ে দেখতেন যে, তাঁর সঙ্গে এ সব কী ঘটছে! যা থেকে আরোগ্য হয়ে বেঁচে থাকা অসম্ভব ওরূপ রোগ-ব্যাধিতে তিনি প্রায়শঃ আক্রান্ত হতে থাকেন। প্রত্যেকবার তার পরের দিনই কেবল স্বাভাবিক আহারই গ্রহণ করতে শুরু করেন নি, বরং তিনি

তাঁর অভ্যাসমত, ডাক্তারগণ তাঁর পক্ষে যে-সব গুরুপাক সুখাদ্য সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন – যেমন, মাখন বা ঘি দিয়ে তৈরী খাদ্য-সেগুলোর জন্যই রাতে রোগাক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও ভোর বেলায় ভালো হওয়া মাত্র বলতেন, "আমাকে মাখনে ভাজা পরটা খাওয়াও।" আর সত্যিসত্যি তা আনিয়ে খেতেন। সেজন্য তাঁর ক্ষেত্রে উক্ত ইল্হামসমূহ অবধারিতভাবে হুবহু প্রযোজ্য হয়, যেমন কিনা বলা হয়েছিলঃ 'আলা খিলাফে তাওয়াক্কো' – অপ্রত্যাশিতভাবে দীর্ঘায়ু-এবং অপ্রত্যাশিতভাবে বার বার আয়ুপ্রাপ্তি এ দু'টি বিষয় তাঁর সত্তায় একশ'ভাগ হুবহু সত্য সাব্যস্ত হয়। তারপর (আলিফযুক্ত-) "আম্মারাহুল্লাহ্ আলা খিলাফিত্ তাওয়াক্কো" – অর্থাৎ 'ইমারত' এ ধরনের দান করা হবে যা প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। আমি তাঁর 'ইমারত' (-আমীর হিসেবে নিযুক্ত হওয়া) সম্পর্কে অঙ্ক কষে দেখেছি যে, আপনারা এর বিবরণ শুনে বিস্মিত হবেন এই বলে যে, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেসের (রাহঃ) খিলাফত কাল থেকে আমীর হিসেবে তাঁর নিযুক্তি-ধারা শুরু হয় এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানীর (রাঃ) বায়ান্ন বছরব্যাপী খিলাফত-কালে অন্য কাউকেই এতো দীর্ঘকাল ব্যাপী আমীর নিযুক্ত করা হয়নি, যতো কিনা খলীফা সালেস এবং আমার খিলাফত-কালে তাঁকে আমীর নিযুক্ত করা হয়। সুতরাং পঁয়তাল্লিশ বার তিনি আমীর নিযুক্ত হন এবং এই হিজরত-কালে চৌদ্দ বছর ব্যাপী এক নাগাড়ে 'আমীর মোকামী' হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। এই হচ্ছে 'খিলাফে তাওয়াক্কো' (-অপ্রত্যাশিত)। চিন্তাই করা যায় না যে, খলীফার মজুদ থাকা অবস্থায় কোন ব্যক্তি এতো দীর্ঘকাল ব্যাপী আমীর নিযুক্ত থাকতে পারেন । সেই 'ইমারত মোকামী,' যা খলীফার নিজের ক্ষমতাভুক্ত হয়ে থাকে এবং কেন্দে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকাকালে তাঁর সরাসরি তত্ত্বাবধানে সাধারণভাবে এতদ্সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকেন, 'সদর-উমূমী'। খলীফার উপস্থিতিতে বস্তুতঃ আমীর-মোকামী স্বয়ং খলীফাই হয়ে থাকেন। সুতরাং তিনি কার্যতঃ আমারই স্থলে বসে পড়েন, অর্থাৎ যে ক্ষমতাসনে আমি উপবিষ্ট হতাম, উহাতে আমার নির্দেশানুযায়ী তিনি বিরাজমান হন। এবং সকল বিষয় অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে সুসম্পাদন করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) "উওহ্ বাদশাহ্ আয়া" – ইল্হামটি সম্পর্কে বলেন যে, "অন্য কেউ বললেন, "সে তো অতঃপর 'কাযী' নিযুক্ত হতে যাচ্ছে।" উক্ত ইল্হামের সঙ্গে এ কথাগুলোও শোনা গেল যে, 'কাযী' বলতে 'হাকাম' (সুবিচারক মীমাংসাকারী)-কেও বুঝায়। কাযী সে- ব্যক্তিই হয়ে থাকে, যে সত্যকে সমর্থন করে এবং অন্য সব কিছুকে তথা মিথ্যাকে রদ করে। এই বিশেষত্বটিও সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহ্মদ সাহেবের মধ্যে অসাধারণরূপে বিদ্যমান ছিল। অসমীচীন কথাকে রদ করার ক্ষেত্রে আমি তাঁর মত অন্য কাউকে দেখিইনি বলা চলে। অনেকে তদ্রূপ হবেন হয়তো, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক রদকারী অন্য কাউকে আমি দেখি নি। খিলাফতের প্রতি নিবেদিত প্রাণ ও প্রেমিক তিনি, এবং আমি যে তাঁর সম্মুখে একজন ক্ষুদ্র বালক ছিলাম, এমনকি বাল্যকালে তাঁর হাতে মারও খেয়েছি তথাপি, এতো নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্মুখে দণ্ডায়মান হয়েছেন যেন তার অন্য কোন দৃষ্টান্তই অবশিষ্ট ছিল না। ভাইদের মধ্যে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের মধ্যে যদি কেউ কখনও আমার সম্পর্কে যৎসামান্যও কোন অসমীচীন কথা বলেছে, তাকে এতো কঠোর ভাষায় উত্তর দিয়েছেন, যেমন 'রদ করার' কথা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, সেই রদ করার কাজটি তিনি এরূপ কঠোরভাবে সম্পাদন করেছেন যে, বহুবারই আমি তা শুনেছি ও দেখেছি। এক্ষেত্রে না কোন ভাইয়ের পরোয়া করেছেন, না কোন নিকটাত্মীয়ের। কখনও যদি তাঁর কাছে কারও ব্যাপারে এতোটুকুও ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে, সে খিলাফতের বিষয়ে ভ্রান্ত কোন ইঙ্গিত দিচ্ছে ওটাকে তিনি কঠোরভাবে রদ করেছেন।

উক্ত বিশেষত্বমূলক অবস্থানটি আরও একটি ইল্হামের কথাও স্মরণ করাচ্ছে। সুতরাং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) হযরত মির্যা শরীফ আহ্মদ সাহেবকে কাশ্ফে দেখেন এবং তাঁকে সম্বোধন ক'রে বলেন যে, "এখন তুমি আমার স্থলে বসো, আমরা চল্লাম" (-আব্ তু হামারী জাগাহ্ বায়ঠ্ আওর হাম চল্তে হ্যাঁয়)। এখন, এতো সুস্পষ্ট যে, উক্ত বিষয়টি হযরত মির্যা শরীফ আহ্মদ সাহেবের ক্ষেত্রে পূর্ণতা লাভ করে নি। তাদের দৃষ্টিতেও পূর্ণতা লাভ করে নি, যারা একথা স্বীকার করতে চান না যে, কোন সময় পিতা সম্পর্কিত ইল্হাম (আসলে) পুত্র সম্পর্কেই (প্রযোজ্য) হয়ে থাকে। বস্তুতঃ এ বিষয়টি হুবহু হযরত মির্যা মনসূর আহ্মদের বেলায় বাস্তবায়িত হয়েছে। যে 'ইমারতে মোকামী'-এর আসনে খলীফা হিসাবে আমি উপবিষ্ট হতাম, বলা বাহুল্য, আমি এখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর স্থালাভিষিক্ত (প্রতিনিধি) এবং হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব জীবিত নেই- যদি কেউ জীবিত মজুদ থেকে থাকেন, তাহলে একমাত্র তাঁর এই পুত্রই আছেন, যাঁর উপর ইল্হামটি হুবহু প্রয়োজ্য হয়– "এখন তুমি আমার স্থলে বোসো,– আমরা চল্লাম"। অতএব, এই যাবতীয় ইল্হাম এবং এগুলোর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, যা ঘটনাবলীও বাস্তব আকারে তুলে ধরছে, তা রদ করা যায় না। নিশ্চিৎ তাঁর একটি মাকাম ও পদ-মর্যাদা ছিল। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত ইল্হামসমূহের মাধ্যমে যে-মাকাম তৈরী হয়েছে এবং উদ্ভাসিত হয়েছে এবং পরবর্তী ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, তাঁর সত্তা ও ব্যক্তিত্ব এক কল্যাণময় সত্তা ছিল এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর ইল্হাম মূলে তাঁর অন্যতম রূহানী পুত্র হবার মর্যাদাও তিনি লাভ করেছিলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) যা কিছু তাঁর পুত্র (হযরত মির্যা শরীফ আহ্মদ) সম্পর্কে (কাশ্ফে) প্রত্যক্ষ করেন, তা তাঁর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। যখন আমি তাঁর পুত্র মির্যা মসরুর আহ্মদ সাহেবকে নাযেরে আ'লা ও আমীর মোকামী নিযুক্তি করি তখন উক্ত ইল্হামটির দিকেও আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, যেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বল্ছেন যে, 'এসো, তুমি আমার জায়গায় বসো'। এই সব কথাই আমাদের অন্তরে এই দৃঢ়-বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহ্মদ সাহেবের আত্মা এক পবিত্র আত্মা ছিল। অত্যন্ত বীর পুরুষ এবং খিলাফতের স্বপক্ষে একটি উন্মুক্ত তলোয়ার-স্বরূপ ছিলেন তিনি। হ্যাঁ, বিগত কয়েক মাস আগে তিনি যখন এখানে সফরে আসেন, ঐ

সফরকালীন তিনি এবার এতো খুশী ছিলেন যে, আমার মনে এ ধারণার উদ্রেক হতো যে, এর পেছনে নিশ্চয় কোন ব্যাপার (রহস্য) আছে। ইতোপূর্বে কোনও সফরকালীন – না এতো দীর্ঘ সময় কখনও সফর করেন, না কখনও নিজেকে এতো আনন্দিত বোধ করেন। এবার ইংল্যাণ্ডে এসে এখানকার অনেক কিছু দেখে বল্‌ছিলেন, "আমার এরূপ মনে হচ্ছে যেন এই প্রথম বারই আমি ইংল্যাণ্ডে বেড়াতে এসেছি এবং এবার যে আনন্দ বোধ করছি তা জীবনে আগে কখনও বোধ করিনি।" জার্মানী এবং হল্যাণ্ডে গিয়েও অনুরূপ অনুভূতি-ই অভিব্যক্ত করেন। আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে এবার এখান থেকে তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল ও হাসি-খুশী গিয়েছিলেন। তাঁর এই অভূতপূর্ব অভিব্যক্তি থেকে আমার মনে এই সন্দেহের উদ্রেক হয়েছিল, যা আমি অন্যভাবে নিতাম, কিন্তু তখনই আমার মনে হয়েছিল, এসবতো বিদায়ের প্রস্তুতিস্বরূপ বটে। তারপর, সেই ভোরবেলায় তিনি এমন ক'রে চলে গেলেন যেন আর কখনও ফিরবেন না। তারপর এখনতো সেই চিরবিদায় নিয়েই চলে গেছেন যে, আর কখনও তিনি ফিরে আসতে পারবেন না। তাঁর অন্তর্ধানে আমাদের মাঝে তাঁর শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে বটে, কিন্তু যে-সব ব্যক্তির সম্পর্কে ইল্‌হামসমূহ দুনিয়াতে বিদ্যমান থাকে, তাঁদের যাওয়ার পশ্চাতেও স্থায়ী চিহ্নাবলী অবশিষ্ট থেকে যায়। তাঁরা চিরকাল অক্ষয় অব্যয় হয়ে থাকেন। সে-দিক থেকে আমি মনে করি, তিনি আদর্শরূপী হয়ে সবসময় আমাদের মাঝেই অবস্থান করবেন। আমার মেয়ে ফায়েযা আমাকে বলেছে, এবার এতো খুশী ছিলেন তিনি যে, বার বার স্নেহ-ভালোবাসায় আমাদের অভিভূত করতেন। একবার আমি তাঁকে বল্‌লাম, 'আপনি, মনে হয় এবার অত্যন্ত খুশী আছেন।' তৎক্ষাণাৎ বল্‌লেন, "খুশী হবো না তো কী? আমার খলীফা যে আমার প্রতি খুশী আছেন। আমি বার বার লক্ষ্য করেছি যে, তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট, এবং তিনি নিজেও খুশী আছেন। তুমি কি বাচ্চাদের দেখ না, যারা তাঁর সঙ্গে ছুটে বেড়ায়-তাদের আনন্দ তুমি কি দেখ না? তারা কেন খুশী? এ জন্যই যে, খলীফা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট।"

বস্তুতঃ তিনি এজন্যই খুশী ছিলেন যে, খলীফা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। আমিও সে-জন্য খুশী। এবার এখানে আসার পরও তাঁর উপর মারাত্মক রোগের আক্রমণ হয়, এবং ফিরে গিয়েও হয়– আল্লাহ্‌তা'আলার ফযলে তা থেকেও তিনি আরোগ্য হন। অত্যন্ত সাহসী ছিলেন তিনি। ওরূপ সাহসী ব্যক্তি দুনিয়াতে খুব বিরল। অস্থিরতা বোধ করতেন তিনি অন্যদের জন্য, নিজের ব্যাপারে নয়। আমার অসুস্থ হয়ে পড়ার ভয় লেগে থাকতো তাঁর অন্তরে। মেয়েদের বলতেন, তাঁর প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রেখো, যত্ন নিয়ো। কখনও কোথাও আমার পৌঁছুতে দেরী হলে সেখানে বসে অস্থির হয়ে অপেক্ষায় থাকতেন, আমার যেন কিছু না হয়ে থাকে। বার বার জিজ্ঞেস করতেন, "কেন এখনও পৌঁছলেন না?' কিন্তু নিজের সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ভিক, নিরুদ্বেগ। অন্যদের ব্যাপারে অত্যন্ত সংবেদনশীল। যাতে অন্য কারও যেন কোন কষ্ট বা কোন অসুবিধা না ঘটে গিয়ে থাকে সে দিকে খেয়াল করে নিজে খুব ভীত ও অস্থিরতা বোধ করতেন। সম্পূর্ণ নির্লোভ-নিঃস্বার্থ স্বভাব ছিল তাঁর। আজীবন অত্যন্ত সরল জীবন-যাপন করেছেন। নাযের-আ'লা হয়েও ছেলে মির্যা মসরুরকে সঙ্গে নিয়ে জমি-জমা পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে যেতেন। সেখানে ক্ষেত-মজুর ও কর্মচারীদের মধ্যে মাটিতে একসাথে বসতেন এবং তাদের সাথে খোলা-মেলা কথাবার্তা বলতেন। তাঁর মধ্যে আত্মম্ভরিতার লেশ মাত্রও ছিল না। সম্পূর্ণ সরল-সহজ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। খাদ্য সুস্বাদু হলে খুশীর সঙ্গে খেতেন। যদি সুস্বাদু হতো না, তবুও রিষ্ট চিত্তেই খেতেন। প্রত্যেক জিনিসের ব্যাপারেই তাঁর মাঝে এক পরিতৃপ্তি বোধ পরিলক্ষিত হতো। এ যিক্‌রে-খায়ের' (-শুভ স্মৃতিচারণ) একটু দীর্ঘ হয়ে গেল। কিন্তু এই যিক্‌রে-খায়ের আসলেই অত্যন্ত মধুর ও কল্যাণবহ। আমি সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহ্‌মদ সাহেবের জন্য দোয়ার প্রতি সমগ্র জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর, তার পুত্র মির্যা মসরুর আহ্‌মদ সাহেবের জন্যও, যিনি পরবর্তীতে নাযেরে আ'লো এবং সদর উমুমী (–আমীর মাকামী) নিযুক্ত হয়েছেন তাঁর জন্যও দোয়া করুন, তাঁকেও যেন আল্লাহ্‌তাআলা সত্যিকার স্থলাভিষিক্তস্বরূপ সাব্যস্ত করেন। "তু আব্ হামারি জাগাহ্ বায়ঠ্ জা" (-তুমি এখন আমাদের জায়গায় এসে বসো) সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু যেন তাঁর উপরও পুরাপুরি প্রযোজ্য হয়, সত্য সাব্যস্ত হয়। আল্লাহ্ স্বয়ং যেন সর্বদা তাঁর রক্ষক ও সহায়ক হন।

যারা বিশেষভাবে সেবা করছেন তাদের কথা না বলাটা অকৃতজ্ঞতার শামিল হবে। মিয়া ফযল আহ্‌মদ ডোগর আমাদের অনেক শোকরিয়া এবং দোয়ার দাবী রাখেন। আমি অন্য কিছ মনে করতাম, কিন্তু বিষয়টি আসলে ভিন্ন ছিল। আমি মনে করতাম, তাঁর জামাতা মির্যা গোলাম আহ্‌মদ সাহেবের সাথে সম্পর্ক সূত্রে তিনি হযরত মির্যা মনসুর আহ্‌মদ সাহেবের সেবা করেন। কিন্তু যখন তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো তখন তিনি আসল বিষয়টি জানালেন এই বলে যে, "হযরত মিয়া সাহেব আমার পিতাতুল্য বরং তার চেয়েও বড় সম্পর্ক আমাদের মাঝে বিদ্যমান। আমার প্রতি তাঁর গভীর স্নেহ, ভালবাসা তাঁর অগাধ অনুগ্রহরাজি আমাকে তাঁর সেবায় অনুপ্রাণিত করে। সুতরাং আমার ভাইদেরকে আমি বললাম, দেখ, তিনি আমাদের জন্য পিতার চেয়েও মর্যাদা রাখেন। আমাদের বংশধরগণও তাঁর ইহ্‌সান ও অনুগ্রহরাজির বদলা দিতে পারবে না। তোমরা মনে করো, যেন তোমাদের পিতা তোমাদের মাঝে এসে গেছেন বরং তার চেয়েও অনেক বড়ো কেউ।" তাই এখন আমার নিকট রহস্য উদঘাটিত হয়েছে যে, কেন মিয়া ফযল আহ্‌মদ এবং তাঁর বড় ভাই সিদ্দীক ও গোলাম আহ্‌মদ এবং পরিবারের সকল সদস্য তাঁর এতো সেবা করেছেন যা কেউ তার পিতারও এর চে' অধিক সেবা করতে পারে না। সব সফরেই সঙ্গে থাকতেন। তাঁর থাকা খাওয়া এবং অন্যান্য সব রকম সুখ-সুবিধার সুব্যবস্থা করেছেন। প্রত্যেক খিদমতের সুযোগকেই নিজের জন্য পরম সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করেছেন। ন্যায়সঙ্গতভাবেই বাহ্যতঃ প্রকাশ ইহাই করেছেন যে, এই সেবা তার উপর কোন অনুগ্রহস্বরূপ নয় বরং এই সেবা তাঁর অধিকারস্বরূপই বটে, তা-ও অত্যন্ত সামান্য পরিমাণ খিদমতের আকারে শোধ করতে সক্ষম হচ্ছেন। সুতরাং আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে তাঁর ভাইগণও হযরত মির্যা মনসুর

আহ্‌মদ সাহেবের অনেক সেবা করেছেন। আমি জামাতের এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই–"হাল্ জাযাউল্ ইহ্‌সানে ইল্লাল্ ইহ্‌সান" (-অনুগ্রহের প্রতিদান অনুগ্রহই হওয়া উচিত)। তদনুযায়ী তারা ইহ্‌সানের ঋণ শোধ করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র প্রিয় বুযুর্গ, যিনি সমগ্র পাকিস্তানের নায়েবে আ'লাও ছিলেন এবং আমীর মোকামী ও সদর আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার সদরও ছিলেন, তাঁর সঙ্গে সকল ব্যক্তি যে-ই সদ্ব্যবহার করেছেন তাঁদেরকেও আমাদের দোয়াতে স্মরণ রাখা উচিত। এ কয়েকটি কথা বলার ছিল হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহ্‌মদ সাহেব সম্পর্কে। জুমুআর নামাযের পর তাঁর নামায জানাযা-গায়েব আদায় করা হবে। রাবওয়ায় অনুষ্ঠিত তাঁর নামায-জানাযায় পাকিস্তানের প্রায় সকল জামাত থেকে অনেক সংখ্যক প্রতিনিধিদল শরীক হচ্ছেন। এ সম্পর্কে বিভিন্ন জামাত থেকে সংবাদ পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু রাবওয়া থেকে এখন পর্যন্তও এ সম্পর্কে কোন সংবাদ এসে পৌঁছতে পারেনি। আশ্চর্যের বিষয়, অথচ নামায-জানাযা আদায়ের পরে পরেই আমাকে জানানো তাঁদের কর্তব্য ছিল–কীরূপে হলো? কী ঘটনাবলী ছিল? লোকসমাগম কীরূপ ছিল? কিন্তু আমি বিস্ময়বোধ করছি যে, সেখান থেকে এখনও কোন সংবাদ আসেনি। আমরা যতবারই যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি ততোবারই ফোনগুলো ব্যস্ত পেয়েছি এবং জুমুআর নামাযের পূর্ব পর্যন্ত আমাদের সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয় নি। সমগ্র পাকিস্তানের যেখান থেকে ইচ্ছা তারা যোগাযোগ করতে পারতেন। কাজেই আমাদের হেড কোয়ার্টারের উচিত– কেন্দ্র তো হচ্ছে আমি যেখানে থাকি – কিন্তু যেখানেই নেযাম জারী রয়েছে, তাদের এটুকুতো সচেতন থাকা উচিত। অথচ অনেক সময় গুরুত্ববহ ব্যাপারেও তারা কানে আঙ্গুল দিয়ে বসে থাকেন। এর পূর্বেও যে-সব অদ্ভুত ধরনের ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলোর সম্পর্কেও বার বার আমার পক্ষ থেকে দৃষ্টি আকর্ষনের পরই তাঁরা জানিয়েছিলেন। যেন তাঁদের দৃষ্টিতে কোন ঘটনাই ঘটেনি। এখন জানাযা সম্পর্কে কিছুই না জানানো বস্তুতঃ বড়ো রকমের যুলুম। ভবিষ্যতের জন্য মনে রাখবেন, পাকিস্তানে সংঘটিত প্রত্যেক গুরুত্ববহ ব্যাপার সম্পর্কে, যেখান থেকেই সম্ভব হয় তাৎক্ষণিকভাবে আমাকে জানানো, নেযামে-জামাতের কর্তব্য। তাৎক্ষণিকভাবে সংবাদ পাওয়াতে দোয়ার জন্যও প্রেরণা জাগে। এ মুহূর্তে, আমি যখন এ বিষয়ে কথা বলছি, মংলা সাহেবের পক্ষ থেকে সংবাদ এসে পৌঁছেছেঃ "আজ নামাযে-জুমুআ মৌলানা সুলতান মাহ্‌মুদ সাহেব পড়িয়েছেন। জুমুআর সঙ্গেই নামাযে আস্‌র (জমা ক'রে) আদায় করা হয়। হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহ্‌মদ সাহেবের তাবুতে (শবদেহ-বাহী বাক্স) এম্বুলেন্স যোগে মসজিদে আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে নামাযে-জুমুআ ও আস্‌রের পর মোহতারম মির্যা আব্দুল হক্ সাহেব নামাযে-জানাযা পড়ান। বিভিন্ন জেলা থেকে আমীরগণ, জামাতসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন। রাবওয়ার বাইরে থেকে আগমনকারী সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও উর্ধ্বে ছিল। নামাযে-জানাযা আদায়ের পর উপস্থিত লোকজন জানাযা কাঁধে বহন ক'রে হযরত আম্মা জান (রাঃ)-এর স্মৃতিবিজরিত সৌধ এবং মসজিদ মুবারক ঘুরিয়ে বেহেশ্‌তি মাকবারায় নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে সমাহিত করার পর অনেক দোয়ার মাধ্যমে তাঁকে বিদায় দান করা হয়।" সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌তাআলার। কেবল সেখানে সমবেত ব্যক্তিদের দোয়াই নয়, বরং দুনিয়ার অসংখ্য স্থান থেকে সমবেদনা ও দোয়ার টেলিগ্রাম, চিঠিপত্র ও ফ্যাক্সের স্তূপ লেগেছে। বিশ্বব্যাপী সকল আহ্‌মদীর অন্তরে এই বেদনাত্মক অন্তর্ধানে এক কম্পনের সৃষ্টি হয়েছে। সকল আহ্‌মদী তাঁর জন্য দোয়ায় আত্ম নিয়োজিত রয়েছেন। অতএব, শুধু পাঁচ হাজারই নয় বরং বিশ্বের সকল আহ্‌মদী দোয়াতে পূর্বে যদি শামিল না হয়ে থাকেন, এখন এই খোৎবা এবং নামাযের পর যখন আমি জানাযার নামায পড়াবো তখন তারা সবাই দোয়াতে শামিল হয়ে যাবেন। সুতরাং বিদায়ের ইহা এক অত্যন্ত মনোরম ভঙ্গী যে, কোন ব্যক্তি বিশ্বব্যাপী সকলের দোয়া কুঁড়িয়ে বিদায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ্‌তাআলা তাঁকে আপন রহমতের বারি-ধারায় সিক্ত করুন এবং আমাদের বিনীত দোয়া কবুল করুন।

এখন নামায সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়-বস্তুর দিকে যাওয়ার আর সময় নেই। পরবর্তী খোৎবায় তা ইন্‌শাআল্লাহ্ বর্ণনা করা যাবে। খোৎবা যদি নির্ধারিত এক ঘন্টার চেয়ে কম সময়েও হয় তাতে কোন দোষ নেই।

হুযুর ভুলবশতঃ আযান দেওয়ার কথা বলেই তা শুধরিয়ে নেন এবং মাঝে-মধ্যে ওরকম ভুল হয়ে যাওয়ার সম্পর্কে বলেন ঃ ভুলবশতঃ কখনও কখনও আযান দেওয়ার কথা বলাটা আমার একটি বহু পুরানো অভ্যাস। সেজন্য দুনিয়াবাসী বিচলিত বোধ করবেন না। এটা কোন মস্তিষ্ক বৈকল্যের লক্ষণ নয়। কেননা, বাল্যকাল থেকেই কোন কোন সময় ওরূপ বলে ফেলার অভ্যাস আমার ছিল এবং এখনও আছে। কখনও ওরকম হলে অনেকে আমার কাছে চিঠি লিখতে আরম্ভ করেন এমন ভাবে যেন আমার কিছু হয়ে গেছে। কিছুই হয় নি। আমি আল্লাহ্‌র ফযলে সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। এখনই আমি বসবো। তারপর উঠে মসনুন খোৎবা সানী পাঠ করবো। অতঃপর নামাযে-জুমুআ এবং তারপর সেই সঙ্গে নামাযে-আসর আদায় করা হবে।

আসলে আমার মস্তিষ্কের প্রাকৃতিক গঠনই এরূপ যে, কোন বিষয়-বস্তু যখন আমার মস্তিষ্কে ছেয়ে যায় বা উহাকে কাবু করে ফেলে, তখন ইহার অবস্থা এমন হয় যেমন দ্রুতগামী মোটর কারকে সহসা ডানে-বায়ে ঘোরানো যায় না। যদি ইহা ত্রুটি হয়ে থাকে তাহলে এই ত্রুটিকে সামনে রেখেই আমাকে তিনি এই পদে সমাসীন করেছেন। ইহা এমন কোন ত্রুটি নয়, যা বয়ঃবৃদ্ধির দরুন ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়। বাল্যকালেও আমার একই অবস্থা ছিল। এবং নামাযে ভুলে যাওয়ার অভ্যাস আমার এবং মীর মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ সাহেবের মধ্যে এবং নওয়াব মোহাম্মদ আহ্‌মদ খানের মধ্যে তখন থেকেই এক ও অভিন্ন (অভ্যাস) ছিল। কেন মানুষ ভুলে যায়? তাতে কী ঘটে-সে সব কথা তো অনেক আলোচনা সাপেক্ষ। হয়তো ভবিষ্যতে ওসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করতে পারি। কিন্তু আপাততঃ এটুকু বলে রাখি যে, অকারণে বিচলিত হয়ে যারা আমাকে চিঠি লেখেন যে, আপনার কিছু হয়ে গেছে, (মনে হয়) তাঁদের কিছু হয়ে গেছে। আমার

কিছুই হয় নি। বাল্যকাল থেকে আমার এই অবস্থা। এই অভ্যাস এবং মস্তিষ্কের এই প্রাকৃতিক গঠন ও বিশেষ অবস্থা যদি খিলাফতের দায়িত্বাবলী পালনে অন্তরায় হতো, তাহলে আল্লাহ্‌তাআলা কখনও আমাকে খলীফা নিযুক্ত করতেন না। সেজন্য বাল্যকাল থেকেই এই অবস্থা। যদি আমি বিশেষ কোন বিষয়ে চিন্তাযুক্ত ও ধ্যানমগ্ন হয়ে পড়ি, তাহলে সহসা অন্যদিকে মোড় ঘুরানো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব হয়ে থাকে। আর এ বিষয়টি-ই নবাব মুহাম্মদ আহ্‌মদ খান সাহেবের মধ্যে অত্যন্ত প্রকটরূপে পরিলক্ষিত হতো। অথচ তিনি অনেক বড় ধরনের আবিষ্কারক এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি ছিলেন। এই যে দার্শনিকদের সম্পর্কে বিভিন্ন গল্প আপনাদের জানা শোনা আছে, যেমন কোন দার্শনিক তাঁর হাতের ছড়ি বিছানায় রেখে নিজে ঘরের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। এগুলো কৌতুক হলেও সঠিক বটে। ভাবনা-চিন্তার তীব্রধারার দরুন ওরূপ ঘটে যায়। এটাকে কোন ধরনের রোগ বলে মনে করবেন না। এগুলো নিত্যকার ঘটনা, যা চিন্তাশীল লোকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত, সাধারণ লোকদের সঙ্গে না। আমি নিজেকে চিন্তাবিদদের মধ্যে গণ্য করাতে চাই না। কিন্তু (যদি এটাকে রোগ বলে ধরা হয় তাহলে) রোগটি উহাই, যা চিন্তাবিদদের হয়ে যায়। সেজন্য এ ব্যাপারে আদৌ কোন ঘাবড়াবার প্রয়োজন নেই। নইলে, ওটা বোকামি হবে। তথাপি কেই কেউ আমাকে লিখেছেন, 'আপনার ঐ রোগ হয়েছে, যাকে 'আরটেরিস ক্লোরোসিস' বলা হয়। যা হযরত মুসলেহ্‌ মাওউদ (রাঃ)-এর শেষ বয়সে হয়েছিল।" ঐ ব্যাধির তো আরও কিছ লক্ষণাবলী রয়েছে। ঐ ব্যাধির যখন সূচনা হয়, তখন কয়েক বছরেই জ্ঞান-বুদ্ধির দিক দিয়ে তো নয়, কিন্তু অন্যান্য ব্যাপারে মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলে। যদি আমার নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ার ব্যাপার হতো, তাহলে যে সময়কার কথা আমি বলছি অর্থাৎ মসজিদে মোবারকে আমি সহ অন্যান্য সবাই নামায পড়তাম, তখন সব সময় তো নয়, কিন্তু অনেক সময়ই নামায শেষে সিজদা সাহু করতে হতো (তাহলে তো পত্র লেখকদের অভিমত অনুযায়ী) তখনই আমার পক্ষে এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদেয় হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। তার আগে তখনই আমার চিন্তা-শক্তি রহিত ও বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়া উচিত ছিল। 'আরটেরিস ক্লোরোসিস' ব্যাধি তো পুরো পা দু'টোর সর্বনাশ ঘটিয়ে দেয়। এবং এখন তো অতো শক্তি নেই কিন্তু যে সময় আমার পায়ে এতো শক্তি ছিলো যে, অনেক দ্রুত দৌড়াতে পারে ওরূপ যুবকদেরও আমি ছাড়িয়ে যেতাম। আর চিন্তা-শক্তি সংক্রান্ত এই ব্যাধি আমার তখনও ছিল। বাইসাইকেল এতো দ্রুত হাঁকাতাম যে, যারা আমার চেয়ে বিশ-ত্রিশ বছর বয়সে ছোট ছিল তাদেরকে মোকাবেলার জন্য চ্যালেঞ্জ করতাম। কিন্তু তারা আমার সঙ্গে পেরে উঠতো না। সুতরাং ...সাহেব নিজে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, "আপনি আহ্‌মদনগর থেকে বাইসাইকেলের পেছনে বোঝা বয়ে আসছিলেন, আমিও তখন সাইকেলে ক'রে যাচ্ছিলাম।" – তিনি তখন ছোট বালক, সুইডেন থেকে আজ তিনি এখানে আমার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে এসেছেন এবং এখন হয়তো এখানেই উপস্থিতও রয়েছেন। তিনি বলেন যে, "আপনি তখন আমাকে থামিয়ে আমার কাঁধে হাত রেখে বল্‌লেন, চলো, ইচ্ছা করলে আমার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পার।' আমি বল্‌লাম, 'তবে হয়ে যাক এক দফা'। প্রথম দিকে তো আপনি আমার সমান-সমানেই ছিলেন কিন্তু পরে আপনি আমাকে এতো পিছনে ফেলে দিলেন যে, আমি অনেক পেছনেই পড়ে গেলাম। অতএব এটা কোন আরটোরিস ক্লোরোসিস রোগ নয় আমার। এঁরা যে চিকিৎসাবিদ বনে বেড়ান, অথচ এ সম্পর্কে তাঁদের কিছুই জানা নেই যে, আরটোরিস ক্লোরোসিস বলতে কী বুঝায়। তাই আজ আমি খোলাসা করে জানাচ্ছি, আমার প্রতি আপাতঃ সহানুভূতিশীল এই ব্যক্তিরা খোদারওয়াস্তে আমাকে এসব কথা আর কখনও লিখবেন না। কেননা, তাতে মানসিক অশান্তি ও ঝামেলা বৃদ্ধি বৈ আমার কোনও উপকার হয় না।

কানাডা সফরে থাকাকালীন আমার যে শারিরীক দুর্বলতার সৃষ্টি হয়ে ছিল তার বিস্তারিত বিবরণ যদি আমি বর্ণনা করি তাহলে আপনাদের মধ্যে যাদের হার্টের দুর্বলতা আছে তাঁদের হয়তো হৃদরোগ হয়ে যেতে পারে। এতো কঠিন চিন্তা-ভাবনা ও রোগ-শোকের আক্রমণের মধ্য দিয়ে ঐ দিনগুলো অতিবাহিত হয়-যা একমাত্র ধর্মীয় স্বার্থেই বা দীনের খাতিরে আমি সয়ে নিতে সমর্থ হই- যেমন গ্যাম্বিয়ায় ঘটমান অবস্থাবলী এবং অন্যান্য কিছ বিষয়াদির দরুন -চিন্তা ভাবনার ফলশ্রুতিতে এতো তীব্রভাবে রোগব্যা ধির আক্রমণ হয় যে, আমি নিজে স্তম্ভিত হই এ জন্য যে, তাসত্ত্বেও আমি যাবতীয় কর্তব্যসমূহ কী ক'রে সম্পাদনে সমর্থ হলাম! তখন অন্যান্য কারও তো কিছু জানাই ছিল না যে, আমার দেহ ও মনের উপর দিয়ে কী ঘটে যাচ্ছে। তবে এ বিষয়ে সমগ বিশ্ব সাক্ষী যে, আমি আমার কর্তব্যসমূহ সম্পাদনে বিন্দুমাত্রও ত্রুটি-বিচ্যুতি হতে দেই নি। জুমুআর খুৎবা প্রদান সহ সমস্ত নামাযই বাজামাত পড়িয়েছি। প্রশ্নোত্তরের সকল অনুষ্ঠানে পুরাপুরি যোগদান করেছি। জামাতগুলোতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অসংখ্য সাক্ষাতের সব দাবী ও চাহিদা পূরণ করেছি। এগুলোর কোনটিতে চিন্দুমাত্রও ত্রুটি ও অভাব ঘটতে দেয়া হয় নি এবং কী পরিস্থিতি ও অবস্থাবলীর মধ্যে দিয়ে যে সব কাজই সুসম্পন করেছি তা একমাত্র আল্লাহ্‌তাআলাই জানেন। এ দুর্বলতা সত্ত্বেও সর্বপ্রকার দায়িত্ব ও কর্তব্যইতো আমি এখনও সুসম্পন্ন করে যাচ্ছি। তাতে আপনাদের কী অসুবিধা? কেন লিখেন যে, আপনি দুর্বল হয়ে গেছেন, আপনি দুর্বল হয়ে পড়েছেন? তারা এটা বুঝেনই না যে, এই দুর্বলতা সত্ত্বেও আপনাদের সব কর্তব্য তো আমি পূরণ করছি। তাতে আপনাদের কী আসে যায়। আমি দুর্বল, কী দুর্বল নই-আল্লাহ্‌তাআলার ফযলে যতদিন জীবিত আছি ও থাকবো, আরদ্ধ সব কর্তব্যই পালন করতে থাকবো, ইনশাআল্লাহ্‌। এরপর আমি মসনুন খুৎবা সানী পাঠ করে সমাপ্ত করছি। যেহেতু এখন নির্ধারিত সময়ের কিছু অবশিষ্ট ছিল সেজন্য আমি ভাবলাম যে, এ কথাগুলোও বলে নেই।

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত)

অনূদিত ঃ মোহ্‌তারাম মাওলানা আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরব্বী

হাকীকাতুল ওহী

মূল ঃ হযরত মির্যা গোলাম কাদিয়ানী ইমাম মাহদীও মসীহ্ মাওউদ

অনুবাদক ঃ নাজির আহমদ ভুইয়া

(১২শ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	সাকিন	জেলা	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার-সংক্ষেপ
১৫	১লা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	নেযাম উদ্দিন	অদ্রাহামা	শাহ্পুর	৩১শে মার্চ আসরের সময় আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার ছিল। তখন আকাশে আগুনের শিখা দেখা গেল এবং তাহা পড়িতে দেখা গেল। যেহেতু পূর্বেই হুযূর প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ৩১শে মার্চে বা ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রকাশিত হইবে, সেজন্য এই ভবিষ্যদ্বাণী এতই সুস্পষ্ট যে, কেহ ইহাকে রদ করিতে পারে না।
১৬	ঐ	গোলাম মোহাম্মদ জাঠ	গোলিকে	গুজরাত	৩১ শে মার্চে আকাশে একটি ভীতিপ্রদ স্ফুলিংগ দেখা গিয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইল।
১৭	ঐ	নূর উদ্দীন	খারিয়া	ঐ	মোবারক হউক ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। ভীতিপ্রদ অগ্নি স্ফুলিংগ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।
১৮	ঐ	মিরান বক্স	শেখু পুরা	ঐ	৩১ শে মার্চ, ১৯০৭ সাল আসরের সময় একটি আগুনের গোলা আকাশ হইতে পতিত হইল। সকলে ইহা উত্তর-পূর্ব দিকে দেখিয়াছে। ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ হইয়া গেল।
১৯	ঐ	গোলাম কাদের	হবুনজল	ঐ	বাশরাহ্ সদর
২০	ঐ	মোহাম্মদ উদ্দিন শিক্ষক	কাকরালী	ঐ	৩১ শে মার্চ, যোহরের নামাযের সময় হাজার হাজার মানুষ ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্যজনক অগ্নি স্ফুলিংগ দেখিল। ইহা দ্বারা ২৫ (পঁচিশতম) দিন সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
২১	ঐ	গোলাম রসূল	লংঘা	ঐ	বাশরাহ্ সদর
২২	ঐ	আহমদ দীন মুর	শাহী ওয়াল	ঐ	৩১ শে মার্চে আসমানী আগুনের একটি ভীতিপ্রদ দৃশ্য দেখা গেল। এই গ্রামের লোকেরা এই অবস্থা দেখিয়া রাত্রে সারা গ্রামে ঢেরা পিটাইল যেন দিনের বেলায় সকলে একটি খোলা মাঠে একত্রিত হইয়া নফল নামায পড়ে। এইভাবে সকল মানুষ ৩১ শে মার্চের ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষী হইল।
২৩	ঐ	সুলতান আলী নম্বরদার	খোখর	ঐ	৩১ শে মার্চে আগুনের একটি ভয়ানক ভীতিপ্রদ দৃশ্য আকাশে দেখা গিয়াছে। সোবহানআল্লাহ্, কত সুস্পষ্টভাবে ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	সাকিন	জেলা	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার-সংক্ষেপ
২৪	১লা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	শেখ এলাহী বক্স পুস্তক বিক্রেতা	গুজরাত	গুজরাত	৩১ শে মার্চ, ১৯০৭ সাল দিনের ৩ ঘটিকার সময় এক টুকরা আগুন মাটিতে পড়িতে দেখা গেল। শহরে ইহা আলোচিত হইয়াছে। লালদারী, মইন উদ্দীনপুর, জামালপুর প্রভৃতি জায়গায় অনুসন্ধান করিয়া জানা গেল যে, এই ঘটনা সব জায়গায় ঘটিয়াছে। ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।
২৫	৩১ শে মার্চ, ১৯০৭ সাল	চৌধুরী মোহাম্মদ খান নম্বরদার	ভালুল পুর চক ১৪৭	লায়াল পুর	টেলিগ্রামের মাধ্যমে সুসংবাদ ও মোবারকবাদ দিতেছি যে, আসমানী আগুন দ্বারা ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
২৬	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চিঠির মাধ্যমে দুইবার লিখিয়াছে যে, ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।
২৭	ঐ	আবদুল মজীদ	মধুপুর	কানগড়	বাশরাহ্ সদর
২৮	১লা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	আব্দুল করীম হিন্দ গার্ড	কিনে	ঐ	একটি আশ্চর্যজনক ও ভীতিপ্রদ আগুন আকাশে দেখা গিয়াছে। ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।
২৯	২রা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	সৈয়্যদ মোহাম্মদ শাহ্ নওয়াজ	ফিরোজ পুর ছাউনী	ফিরোজ পুর	৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটিকে এই আগুন প্রমাণ করিয়া দিয়াছে, যাহা ৩১ শে মার্চে দেখা গিয়াছে।
৩০	ঐ	মৌলবী মোহাম্মদ ফযলু চুঙ্গবী	চুঙ্গা	রাওয়াল পিণ্ডি	এই আগুন প্রকাশিত হওয়াতে ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি খুব সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে, যাহা ৩১ শে মার্চে দেখা গিয়াছে। অতএব ১০০ বৎসরের বৃদ্ধরা বলে, আমরা এইরূপ ঘটনা কখনো দেখি নাই।
৩১	ঐ	ওয়ারেস আলী খান	কওম গুজর	ঐ	যে নিদর্শনটি ৩১ শে মার্চে পূর্ণ হওয়ার ওয়াদা দেওয়া হইয়াছিল তাহা আসমানী আগুন দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহা ভীতিপ্রদ ও বিস্ময়কর ছিল এবং দেখা ও শুনার উর্ধ্বে ছিল।
৩২	ঐ	আবদুল মজীদ খান	কপুর থলা	কপুর থলা	একটি বিস্ময়কর ঘটনার খবর দেওয়া হইয়াছিল যে, ৩১ শে মার্চ, ১৯০৭ সালে ইহা প্রকাশিত হইবে। এই ভবিষ্যদ্বাণীটি একটি আসমানী আগুন সৃষ্টি হওয়ার দ্বারা পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, যাহা ৩১ শে মার্চে আকাশে দেখা গিয়াছে। বহু লোক উহা দেখিয়া বেহুশ হইয়া গিয়াছে। অনেকে সেজদায় লুটাইয়া পড়িয়াছে।
৩৩	২রা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	এনায়েত উল্লাহ্ আহমদী	ভুচাল কালা	ঝিলাম	মোবারক হউক। ৩১শে মার্চে যে নিদর্শনটি প্রকাশিত হওয়ার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, তাহা একটি আসমানী আগুন দেখা দেওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ইহা একটি বিস্ময়কর দৃশ্য ছিল।

ক্রমিক নম্বর	চিঠি প্রেরণের তারিখ	প্রেরকের নাম	সাকিন	জেলা	চিঠির বিষয়-বস্তুর সার-সংক্ষেপ
৩৪	১লা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	হায়াত মোহাম্মদ কনষ্টেবল পুলিশ	ঝিলাম	ঝিলাম	এই ঘটনায় খুব খুশী হইয়াছি যে, যে নিদর্শনটি সম্পর্কে এই সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল যে, ৩১ শে মার্চ বা মার্চের একত্রিশতম দিনে পূর্ণ হইবে, সেই নিদর্শনটি আসমানী আগুন দেখা দেওয়ার মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে।
৩৫	ঐ	করমদাদ আহমদী	দোল মিয়াল	ঝিলাম	হুযূরকে হাজার মোবারকবাদ জানাই। ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীটি পরিপূর্ণ ও সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। ৩১ শে মার্চ সন্ধ্যার নিকটবর্তী সময়ে আকাশে একটি ভীতিপ্রদ আগুন দেখা গিয়াছে। ইহা ঈমান বাড়াইয়া দিয়াছে।
৩৬	৩১ শে মার্চ	মোহাম্মদ জান শেখ	উজিরা বাদ	গুজরাঁ ওয়ালা	হুযূরকে মোবারকবাদ জানাই। ৩১ শে মার্চে যে বিস্ময়কর ঘটনা ঘটার সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল, সেই ঘটনা ৩১ শে মার্চে প্রকাশিত হইয়াছে। একটি বিস্ময়কর আগুন আকাশে দেখা গিয়াছে।
৩৭	১লা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	জীবন খান ভাটী	ঐ	ঐ	মোবারকবাদ জানাই। ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ ৩১ শে মার্চে আসমানী আগুন দেখিয়াছে।
৩৮	৩রা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	ফযল এলাহী, ডাক বিভাগের ওভার শিয়ার	গুরুদাস পুর	গুরুদাস পুর	৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই নক্ষত্রের চমকে এক ব্যক্তি গুরুদাসপুরের পুকুরে ডুবিয়াছে। ইহা মহকুমা শহর সংলগ্ন স্থান। হাজার হাজার লোকের মধ্যে ও গ্রামে গ্রামে এই ইলহাম আলোচিত হইতেছে।
৩৯	২ সদর	শেখ রহীম বক্স পুস্তক বিক্রেতা	জম্মু	জম্মু	খুব সুস্পষ্টভাবে ৩১ শে মার্চ সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। ভুরি ভুরি লোক আসমানী আগুন দেখিয়াছে।
৪০	৩১ শে মার্চ	শেখ মোহাম্মদ তৈমুর ছাত্র	জম্মু	জম্মু	খোদার শোকর, ৩১ শে মার্চের ভবিষ্যদ্বাণী খুব সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইয়াছে। যেভাবে বর্ণনা করা হইয়াছিল ঠিক সেইভাবে ৩১ শে মার্চে একটি ভীতিপ্রদ ও আশ্চর্যকর আগুনের পিণ্ড আকাশে দেখা গিয়াছে।
৪১	১লা এপ্রিল, ১৯০৭ সাল	রহমত উল্লাহ আহমদী	বোঙ্গা	হুশিয়ার পুর	৩১ শে মার্চে কেবল আগুনের গোলাই দেখা যায়নি, বরং কোন কোন জায়গায় কালো মেঘের বৃষ্টি বর্ষিত হইয়াছে। ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মোবারক হউক। (ক্রমশ:)

ইনকিলাবে হাকীকী
(প্রকৃত বিপ্লব)

[মূল ঃ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী,আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)]

(দ্বাদশ কিস্তি)

সভ্যতা সংস্কৃতির তাৎপর্য

ইহাও সুস্পষ্ট যে, পৃথিবীতে সভ্যতা-সংস্কৃতির অর্থই এই যে, হত্যা এবং ঝগড়া-ফাসাদের কতিপয় বৈধ অবস্থা সৃষ্টি করা। যেমন দেখে নাও, যায়েদ হত্যা করে এবং দুনিয়ার দৃষ্টিতে সে হত্যাকারী বলে বিবেচিত। কিন্তু যখন ঐ যায়েদকেই সরকার ফাঁসী দেয় তখন সরকার হত্যাকারী বিবেচিত হয় না বরং তার কর্মকান্ড বৈধ এবং প্রশংসাই বলে বিবেচিত হয়।

এমনিভাবে কোন লোক যদি কারও বাড়ী বা সম্পত্তি দখল করে নেয় তাহলে সকলে বলবে সে কলহপরায়ণ। কিন্তু সরকার দেশের প্রয়োজনের তাগিদে যদি সম্পত্তি দখল করে নেয় তাহলে এ কর্ম লোকদের দৃষ্টিতে বৈধ বলে মনে হয়।

এভাবে যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আবদ্ধ করে রাখে তাহলে তা নির্যাতন বলে আখ্যায়িত হয়। কিন্তু সরকার যদি কাউকে নজরবন্দী (গৃহে অন্তরীণ) করে রাখে এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে তখন ইহা বৈধ এবং প্রয়োজনীয় মনে করা হয়।

অতএব যখন খোদাতাআলা বল্লেন, আমরা দুনিয়াকে সভ্য-সংস্কৃতিবান বানাতে চাই এবং আমরা এক ব্যক্তিকে আমাদের খলীফা বানাতে চাই— যে আইন-কানুন প্রয়োগ করবে, যে আইনের মাধ্যমে কতক লোককে হত্যার শাস্তি প্রদান করবে, যে আইনের মাধ্যমে কতক লোকের সম্পত্তির ওপরে শক্তিপ্রয়োগ করে দখল নিয়ে নেবে। যে আইনের মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে। যেহেতু ইহা একটি সর্বৈব নতুন কথা ছিলো তাই ফিরিশ্তারা আশ্চার্যান্বিত হলেন, আর তারা বিচলিত হয়ে পড়লেন যে, ইতোপূর্বে তো হত্যা করা অবৈধ বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু এখন এক প্রকার হত্যা বৈধ হয়ে যাবে ? এর পূর্বে ঝগড়া-ফাসাদ করা অবৈধ নির্ধারণ করা হয়েছিলো কিন্তু এখন এক প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ বৈধ হয়ে যাবে ?

এ দৃষ্টিভঙ্গি প্রাচীন কালের প্রেক্ষাপটে লোকদের জন্যে নেহায়েতই গুরুত্ব বহন করতো বরং এ আপত্তি আজও দুনিয়াতে উত্থিত হচ্ছে। যেমন, ইউরোপে একটি বিশেষ সংখ্যার লোক এমন আছে যারা ফাঁসীর শাস্তির বিরোধিতা করে আর তারা এর এই দলীল দেয় দেয়, যখন কাউকে হত্যা করা অবৈধ তখন সরকার কেন কাউকে হত্যা করবে ? যদিও সরকার কেবল ফাঁসীই দেয় না এবং কোন প্রকার কর্ম যা কতক পাপের সাথে সাদৃশ্য রাখে তা সরকার করে থাকে। যেমন, ট্যাক্স আদায় করে। আর যদি আগে বর্ণিত ধারণা ঠিক হয়ে থাকে তাহলে ইহাও বলতে হবে যে, ট্যাক্স আদায় করা যেহেতু চুরি ডাকাতির অনুরূপ উহাকেও পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এসব লোক ট্যাক্সের ওপর আপত্তি তোলে না। অতএব জানা গেল যে, ঐসব লোকদের ফাঁসীর ওপরে আপত্তি কেবল একটি খেয়াল এবং দূরদর্শিতার অভাবের ফল।

প্রাথমিককালে যেহেতু তখনও শাসন ব্যবস্থার পদ্ধতি প্রচলিত হয়নি, দুনিয়া সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে অনেক দূরে ছিলো এজন্যে যখন কোন ব্যক্তি কাউকে মেরে ফেলতো তখন মনে করা হতো যে, সে বড়ই মন্দ কাজ করেছে। যখন কারও ধন-সম্পদ লুট-পাট করতো তখন প্রত্যেকই বলতো যে, এ ব্যক্তি খুবই খারাপ আচরণ করেছে। কিন্তু যখন খোদাতাআলা শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এ আইন প্রচলিত হলো যে, যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে, তাকেও হত্যা করা হবে। তখন লোকেরা বিস্মিত হলো এবং তারা বল্লো, এটা কী হলো ? একজনের জন্যে হত্যা করা বৈধ এবং আর একজনের জন্যে হত্যা করা বৈধ নয়। একজনের লুট-পাট করা বৈধ আর অন্যের জন্যে লুট-পাট বৈধ নয়। সরকারের জন্যে ট্যাক্স আদায় করা বৈধ হবে আর অন্য কোন লোক যদি শক্তি প্রয়োগ করে কারও পয়সা উঠিয়ে নেয় তাহলে উহাকে অবৈধ বলা হবে ?

যেমন ঐসব কর্ম যাকে খারাপ মনে করা হতো ওগুলো যখন সরকার করে তখন তার নাম সভ্যতা-সংস্কৃতি রাখা হয় আর কেউ ইহাকে খারাপ মনে করে না। কিন্তু কোন ব্যক্তি যদি ঐ কর্ম করে তাহলে তা খারাপ মনে করা হয়।

সভ্যতা-সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার ওপরে আপত্তিসমূহ ঃ

তাই যখন ফিরিশ্তাদেরকে আল্লাহ্তাআলা বল্লেন যে, এখন দুনিয়াতে নেযাম ও ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন হতে যাচ্ছে তখন তারা খুবই বিস্মিত হলেন এবং তারা মনে করলেন যে, ঐ নতুন নিয়মের মাধ্যমে যদি আদম মানুষ হত্যা করে তখন বলা হবে যে, ইহা বড়ই পুণ্যের কাজ। যদি আদম মানুষের নিকট থেকে শক্তি প্রয়োগ করে ট্যাক্স আদায় করে তাহলে বলা হবে যে, এ ব্যক্তি বড়ই সম্ভ্রান্ত। ইহা এক আশ্চর্য রকমের দর্শন।

আজ আমরা এ প্রশ্নের তাৎপর্য পুরোপুরি বুঝতে পারি না। কিন্তু যখন এই নিয়ম নতুন নতুন প্রবর্তিত হয়ে থাকবে লোকেরা তখন অতীব বিস্মিত হয়ে থাকবে। এখনও যেভাবে আমি বলেছি এমন লোকের সন্ধান মিলবে যে, এ নিয়মের ওপরে আপত্তি তুলবে। যেমন, বন্য গোত্রের লোকেরা এখন পর্যন্ত বলে যে, সরকার কেন হত্যা করে ? যদি আমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি আমাদের কাউকে হত্যা করে তাহলে আমরা নিজেরা তাকে হত্যা করবো। সরকারের মাঝখান থেকে অযথা নাক গলানোর কি দরকার ? আর তাদের তৃপ্তি হয় না যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিশোধ গ্রহণ না করে। মানবীয় মস্তিষ্কের প্রাথমিক অবস্থা ছিলো ইহাই। আর বুদ্ধি-জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে আজও কতক লোকের মধ্যে ইহা সৃষ্টি হয়ে যায়।

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, ফিরিশ্তা এর ওপরে আপত্তি তোলে না যে, আদমের বংশধর জন্মগ্রহণ করলে পর হত্যা ও রক্তপাত হবে

বরং এর ওপরে আপত্তি তোলে যে, মানুষের ওপরে এমন এক ব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হবে যে, এসব মন্দ কাজ করবে। আর তার এসব কর্মকে সিদ্ধ বলে নির্ণয় করা হবে।

ইহা একটি এমন মানসিক বিপ্লব ছিলো যে, ঐ সময়ের প্রেক্ষাপটে উহাকে দেখে জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়ে গিয়ে থাকবে। আর লোকদের নিকট ইহা স্বীকার করা যে, এক ব্যক্তি তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার ধন-সম্পদ করায়ত্ব করবে এবং তাদের মধ্যে কতককে ফাঁসী পর্যন্ত দিতে পারবে এবং তার এ কর্ম সিদ্ধ বলে মেনে নিতে হবে, খুবই কঠিন ও কষ্টদায়ক কাজ বলে মনে হয়ে থাকবে। সে হয়ত বলতো যে, আমরা এক ব্যক্তিকে মেরে ফেলেছি ইহা তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখে। তারা জানে আর আমরা জানি (কীভাবে ব্যাপারটি সুরাহা হবে)। মাঝখানে এ ব্যক্তি হুমকি-ধমকি দেবার কে ? যেমন, আজকালও প্রতিবন্ধী লোকেরা ঐসব ধারণায় নিপতিত এবং এসব লোকদের জন্যে সরকার বিব্রতকর অবস্থায় পতিত হয়। যেমন, বেলজিয়ামে তো সম্ভবতঃ ফাঁসীর শাস্তি উঠিয়েই দিয়েছে আর তারা কেবল এই দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যা আমি বলে এসেছি।

যদি ঐ সব লোক যাদের কথায় ফাঁসীর শাস্তি রদ করা হয়েছে, তারা আমার সামনে থাকতো তাহলে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করতাম যে, ফাঁসির শাস্তি তো তোমরা মিটিয়ে দিলে কিন্তু ট্যাক্সের পদ্ধতিকে কেন উঠিয়ে দিলে না। উহাও তো অন্যের সম্পত্তিতে অবৈধ দখলের শামিল।

আসল কথা এই যে, এ ধরনের ধ্যান-ধারণা ঐ কথারই সাক্ষ্য বহন করে যে, ইউরোপবাসীর মন-মস্তিষ্কে অধঃপতন শুরু হয়েছে। আর প্রকৃতপক্ষে সরকারী কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি এসব প্রতিবন্ধী লোকদের কারণেই হয়ে থাকে। পার্থক্য কেবল এই যে, এখন যেহেতু সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে, এখন এ ধারণা তো সৃষ্টি হয় না যে, সরকারকেই একেবারে উৎখাত করে দেয়া হোক। অবশ্য এখন এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এ সরকারের স্থলে অন্য সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে আমাদের স্বার্থ অধিক সংরক্ষিত হবে এবং এর জন্যে (সরকার) পরিবর্তনের চেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু অসভ্য জাতির অবস্থা এখনও এই যে, তারা সরকার ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে যে-কোন রঙ্গেই হোক না কেন অপসন্দ করে থাকে। উহাকে বরদাশ্‌ত করা তাদের জন্যে বড়ই কঠিন ও মুশকিলের কাজ। তারা অন্যের হস্তক্ষেপের ব্যাপারটিতে খুবই বিচলিত হয়। যেমন, তাদের নগ্নভাবে চলা ফেরাতে যদি সরকার আপত্তি তোলে তাহলে তারা বলে আমরা নগ্নভাবে চলাফেরা করলে তাতে কার বাবার কী যে, আমাদের কাপড় পড়তে বাধ্য করে ? আমরা নগ্ন শরীরে থাকলে আমাদের গায়ে হাওয়া বাতাস লাগে আর আমাদের আনন্দ লাগে। আমরা ইহা বরদাশ্‌ত করতে পারি না যে, আমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে কেউ নাক গলাক।

যেমন, বৃটিশ কর্তৃক দখলের প্রাথমিক দিকে যখন আফ্রিকার শহরগুলোতে হাবশীরা উলঙ্গ অবস্থায় প্রবেশ করতে আসতো তখন শহরের সিংহদরজায় সরকারী কর্মকর্তা নিযুক্ত হতো। তারা তাদেরকে লুঙ্গি দিতো আর বলতো লুঙ্গি পরে শহরে যেতে পারো উলঙ্গ যেতে পারবে না। তারা লুঙ্গিতো পরতো কিন্তু এধার ওধার দেখতে দেখতে যেতে থাকতো যে, কোন হাবশী তাদের এ বেহায়াপনা দেখে ফেল্ল নাকি! আর যখন তারা একে অপরকে দেখতো তখন (লজ্জায়) চোখ বন্ধ করে ফেলতো এই ভেবে যে, এ রকম বেহায়াপনা আমাদের দ্বারা হওয়া উচিত নয়। পরে আবার যখন শহর থেকে বের হয়ে আসতো তখন তাড়াতাড়ি করে লুঙ্গি খুলে কর্মকর্তার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে সরে পড়তো।

বরং এখন তো ইউরোপে কতক লোক এমন জন্ম নিয়েছে যে, তারা উলঙ্গ থাকে। আর অন্যদেরকেও উলঙ্গ থাকার জন্যে নির্দেশ দেয়। বরং একবার তো একথা নিয়ে সংঘর্ষ হয়ে গেছে। তারা চাপ প্রয়োগ করতে থাকলো যে, আমরা উলঙ্গ শরীরে শহরে প্রবেশ করতে চাই। আর পুলিশ বলল না, কাপড় পরে আসো। তারা বল্লো, তোমরা কারা যে, আমাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে চাও? তোমরা চোখ বন্ধ করে নাও আমাদের দিকে তাকিও না। কিন্ত তোমরা আমাদের কাপড় পরতে বাধ্য করছো কেন? পরিশেষে যখন ঝগড়া বেড়ে গেলো তখন পুলিশকে গুলি চালাতে হলো ।

ইহাও ইউরোপের পতনের একটি চিহ্ন যে, এখন সেখানে এক শ্রেণীর লোকের বোধ শক্তি একেবারেই দুর্বল হয়ে গেছে । ইউরোপে কতক ক্লাব এমন আছে যে, যারা কাপড় পরে গোসল করে তারা কোনক্রমেই সেখানকার সদস্য হতে পারে না। কেননা, তাদের দৃষ্টিতে এখনও ঐ ব্যক্তি পুরোপুরি সংস্কৃতিমনা হতে পারে নি ।

আমি এ প্রসঙ্গে একখানা পুস্তকও পাঠ করেছি। এর মধ্যে একজন ডাক্তার লিখেছেন যে, আমার মেয়ে নগ্ন সমিতির (Nude Society) সদস্য হয়ে গেছে। এ কথা আমাকে কঠিন পীড়া দিতো। আর আমি তার ওপরে কঠোরতা শুরু করলাম। পরিশেষে একদিন আমার মেয়ে আমাকে বল্লো, আব্বু ! একদিন গিয়ে দেখো তো যাদেরকে তোমরা অসভ্য বলছো তারা কতো সভ্য এবং ভদ্র লোক ? সুতরাং তিনি লেখেন যে, একদিন আমার মেয়ে আমাকে জোর করে ঐ সমিতিতে নিয়ে গেলো। যখন আমি সেখানে পৌছলাম তখন আমি দেখলাম যে, সবাই নগ্ন দেহে ঘোরা ফিরা করছে। ইহা দেখে প্রথমেতো লজ্জায় আমার মাটির সাথে মিশে যাওয়ার উপক্রম হলো। কিন্তু পরে আমি দেখলাম যে, তাদের চেহারার মধ্যে এতই অকপটতার ছাপ ছিলো যে, তার কোন সীমা নেই। সুতরাং ইহা দেখে আমার ধারণাও পাল্টিয়ে গেলো। এবং আমিও কাপড় ফেলে তাদের ভীরে মিশে গেলাম। মোদ্দা কথা, আল্লাহ্‌তাআলা হযরত আদম আলায়হেস সালামের মাধ্যমে প্রথম বার মানব প্রজন্মের সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করলেন। আর বল্লেন, তোমাদের মধ্যে কতক অযথা নগ্নভাবে চলা ফেরা করায় বিশ্বাসী হবে কিন্তু আমরা তাদেরকে নগ্নভাবে চলাফেরা করতে দেবো না। যেন মানবীয় স্বাধীনতার ওপরে আদম কতক বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে দিলেন এবং তাদেরকে একটি আইনের বন্ধনে আবদ্ধ করে দিলেন। (চলবে)

অনুবাদক ঃ মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল ঃ আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, লায়েলপুরী

ভাষান্তর ঃ এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার (মরহুম)

(৫ম কিস্তি)

চতুর্থ প্রশ্ন

এ স্থলে আমাদের প্রশ্ন, যদি মওদুদী সাহেবের মতে আহ্‌মদীয়া জামাত 'খাতামুন্‌নাবীয়ীন' আয়াত এবং 'লা-নাবীয়া বাদী' প্রভৃতি হাদীসের এই অর্থ করিবার ফলে 'খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী' হয়, তবে কি এই তের জন বুযুর্গানে দীনের উপরও তিনি কুফরীর ফতওয়া দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ?

ইসলামী পরিভাষায় 'নবুওয়ত' অর্থ

নবুওয়তের জন্য ইস্‌লামে দুইটি পারিভাষিক শব্দ আছে। মুকাররম মৌলবী সৈয়্যদ মুহাম্মদ হাসান আমরোহী সাহেব তৎপ্রণীত 'কাওকাবে দুর্‌রী' নামক কেতাবে লিখিয়াছেন ঃ

"ইসলামী পরিভাষায় নবুওয়ত হইতেছে বিশেষ প্রকারে ঐশী-সংবাদ দান এবং ইহা দুই প্রকার। এক প্রকার নবুওয়ত তশ্‌রীয়ী বা 'শরীয়তবাহী'। ইহা খতম হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রকার নবুওয়ত 'সংবাদ দান অর্থে'। ইহা বন্ধ হয় নাই। সুতরাং, ইহার যাবতীয় প্রকারসহ ইহাকে 'মুবাশ্‌শেরাত' (সুসংবাদ) বলা হয়ঃ [কাওকাবে দুর্‌রী']।

আহমদীয়া সেলসেলার প্রতিষ্ঠাতার দাবী প্রথম প্রকারের নহে, দ্বিতীয় প্রকারের। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলেন ঃ

"নবুওয়ত দ্বারা আমি এই বুঝাই না যে, নাউযুবিল্লাহ্‌ (আমি আল্লাহ্‌র আশ্রয় লই) আমি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মুকাবেলায় দাঁড়াইয়া নবুওয়তের দাবী করি, কিংবা কোন নূতন শরীয়ত আনিয়াছি । আমার নবুওয়ত আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লামের অনুবর্তিতায় প্রাপ্ত বহু ঐশী বাক্যালাপ মাত্র বুঝায়। ঐশী বাক্যালাপ আপনারাও স্বীকার করেন। সুতরাং, ইহা শুধু শব্দ নিয়া বাকবিতণ্ডা। অর্থাৎ, আপনারা যে বিষয়ের নাম 'ঐশী বাক্যালাপ' রাখেন, আমি উহার প্রাচুর্যের নাম ঐশী আদেশে 'নবুওয়ত' রাখিঃ [তাতিম্মায় হাকীকাতুল্‌ ওহী]।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন

মওদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়ত' এ আগমনকারী মসীহ সংক্রান্ত কতকগুলি রেওয়ায়াত উদ্ধৃত করিবার পর লিখিয়াছেন ঃ

"তিনি জীবিত আছেন অথবা ইন্তেকাল করেছেন – এ আলোচনা এখানে অবান্তর। যদি ধরে নেয়া যায় যে, তিনি ইন্তেকাল করেছেন তাহলেও আল্লাহ্‌ তাঁকে জীবিত করে আবার দুনিয়ায় নিয়ে আসবার ক্ষমতা রাখেনঃ ['খতমে নবুওয়াত.' বাঙলা সংস্করণ ৬২ পৃঃ, উর্দূ সংস্করণ ৫৪ পৃঃ]।

হযরত ঈসা আলায়হেস্‌ সালামের হায়াত ও ওফাতের তক এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। ইহা অত্যন্ত জরুরী। কারণ ঈসা আলায়হেস সালামকে ওফাতপ্রাপ্ত বলিয়া প্রত্যয় করিবার ফলে আহ্‌মদীয়া জামাত হযরত মসীহ ইবনে মরিয়মের অবতরণকে একজন উম্মতি ব্যক্তির রূপক আবির্ভাব বলিয়া বিশ্বাস করে। প্রকৃতপক্ষে, মওদুদী সাহেবের এই তর্ক এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টার কারণ – তিনি ভাল মত জানেন যে, আহ্‌মদীয়া জামাতের সম্মুখে হযরত ঈসা (আঃ)-এর জীবিত থাকা প্রমাণ করিবার মত সাহস তাঁহার নাই। কারণ কুরআন করীমের স্পষ্ট উক্তি তাঁহার মৃত্যুর উজ্জ্বল দলীল। হযরত ঈসা আলায়হেস্‌ সালাম এই বাক্য দ্বারা খোদাতাআলার হুযূরে বলিতেছেন ঃ

"আমি আমার জাতির মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত পর্যবেক্ষক ছিলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তাহাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলাম। কিন্তু যখন তুমি আমাকে ওফাত দিলে, অতঃপর তুমিই তাহাদের নিগরান ছিলেঃ [সূরা মায়েদা, শেষ রুকূ]।

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলী ঈসা মসীহ নাসেরী (আঃ)

অন্য কথায় তিনি বলেন যে, তাঁহার জাতি তিনি উপস্থিত থাকা কালে– অর্থাৎ. তাঁহার জীবদ্দশায় বিকৃত হয় নাই। তাঁহার জীবনকালে তাহারা তাঁহাকে এবং তাঁহার মাতাকে উপাস্যে পরিণত করে নাই। তাহারা বিকৃত হইয়া থাকিলে তাঁহার ওফাতের পরেই বিকৃত হইয়াছে, তাঁহার পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণরূপে শেষ হইয়াছিল। যেহেতু হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের উম্মতের ধর্ম-মত বিকৃত হইয়া গিয়াছে, এ জন্য হযরত ঈসা আলায়হেস্‌ সালামের ওফাত তাঁহার এই বিকৃতি অনুসারে উজ্জ্বল দিবালোকের ন্যায় প্রকাশিত।

সেইরূপ হাদীস শরীফে বর্ণিত হইয়াছে ঃ

"নিশ্চয় ঈসা ইবনে মরিয়ম এক শত বিশ বৎসর জীবিত ছিলেনঃ [কানযুল উম্মাল, তিব্রানী]।

সুতরাং, তাঁহার এই সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ দুই হাজার বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকার ধারণা এই সকল স্পষ্ট উক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। মৌলবী মওদুদী সাহেব তাঁহাকে **"ইন্তেকাল করেছেনঃ** বলিয়া ধরিয়া নিয়াও তিনি পুনরুজ্জীবিত হইবেন বলিয়া ধারণা প্রকাশ করা কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট উক্তিসমূহের বিরোধী হওয়ার কারণে একেবারেই বাতিল। কুরআন মজীদে আল্লাহ্‌তাআলা বলেনঃ

"আল্লাহ্‌তাআলা আত্মাগুলিকে উহাদের মৃত্যুর সময় আয়ত্ত করেন এবং যাহারা মরে না, তাহাদিগকে নিদ্রার মধ্যে হরণ

(অবশিষ্টাংশ ২৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত
কোর্টের কিছু রায়

–মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

কোর্টের কিছু রায়ের খবর পরিবেশন করা হলো। এগুলোকে কেন্দ্র করে কিছু বক্তব্য পেশ করা হচ্ছে।

খবরগুলো হলো; দৈনিক জনকণ্ঠে ১নং খবরটি ২৩শে আগষ্ট '৯৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। ২নং খবরটি দৈনিক সংবাদে ২৩শে অক্টোবর '৯৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। ৩নং খবরটি একই পত্রিকায় ১৮ই অক্টোবর '৯৭ তারিখে এবং ৪নং খবরটিও একই পত্রিকায় ১৭ই অক্টোবর '৯৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে।

ডলি ধর্ষণ মামলার রায়
ম্যাজিস্ট্রেটের ১০ বছর কারাদণ্ডাদেশ

জয়পুরহাট, ২২ আগস্ট (সংবাদদাতা) – ডলি ধর্ষণ মামলার আসামী ম্যাজিস্ট্রেট দেবাশীষ রায়কে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড, ৩ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ১ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আব্দুস সামাদ সম্প্রতি এ দণ্ডাদেশ প্রদান করেন। দণ্ডিত আসামী পলাতক থাকায় আটকের পর থেকে তার এ দণ্ডাদেশ কার্যকর হবে।

মামলার বিবরণে জানা যায়, ১৯৯৪ সালের ২ অক্টোবর সদর থানাধীন দোগাছি গ্রামের মৃত বছির উদ্দিনের কন্যা শাহানাজ পারভীন ডলিকে (২৪) ডিসি অফিসে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে জেলা পরিষদের সাবেক সচিব ম্যাজিস্ট্রেট দেবাশীষ রায় অপর একজন ম্যাজিস্ট্রেটের খালি বাসায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

(দৈনিক জনকণ্ঠ / ২৩.৮.৯৭)

শিশুহত্যা ঃ হবিগঞ্জে ৪ জনের মৃত্যুদন্ড যাবজ্জীবন ২ জনের

হবিগঞ্জ, ২২শে অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)। – আজ বুধবার হবিগঞ্জ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে শিশু সালমা হত্যা মামলার রায়ে ৪ জনকে মৃত্যুদন্ড এবং ২ জনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে। অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মফিজুল ইসলাম এ রায় প্রদান করেন।

মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্তরা হলো মনু মিয়া, তার ছেলে সেলিম, আবদুল আহাদ ওরফে ভক্কা ও আবদুল্লাহ। সেলিমের মা আনোয়ারা বেগম ও আত্মীয় কুলসুম বিবিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড দেয়া হয়েছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ, ১৯৯৩ সালের ২৮শে মে আজমিরীগঞ্জ থানার জনগোকা গ্রামের কুয়েত প্রবাসী হোসেন আহমেদের ৭ বছরের কন্যা সালমাকে অপহরণ করা হয়। পরদিন ভোর সাড়ে ৬টায় পুলিশ ঐ গ্রামের মনু মিয়ার পুকুর থেকে বস্তাভর্তি অবস্থায় তার গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে।

এ ব্যাপারে থানায় মামলার পর পুলিশ ১০ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করে। আজ মামলার রায়ে ৪ জনকে খালাস দেয়া হয়।

(সংবাদ / ২৩.১০.৯৭)

শিশুকে ধর্ষণের দায়ে একজনের মৃত্যুদন্ড
(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

চট্টগ্রাম, ১৭ই অক্টোবর। – চট্টগ্রাম নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ আদালতের জজ সৈয়দ এনায়েত উল্লাহ গতকাল প্রদত্ত এক রায়ে পাঁচ বছরের শিশু রিপাকে ধর্ষণের অভিযোগে মোহাম্মদ মিয়া নামে এক ব্যক্তিকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ প্রদান করেছেন। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত আসামীকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে রাখার জন্য রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলার বিবরণে প্রকাশ '৯৫ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় নগরীর ডবলমুরিং থানাধীন পানওয়ালা পাড়ায় ফারুক হোসেনের ৫ বছরের শিশুকন্যা রিপাকে আইসক্রিম খাওয়ানোর লোভ দেখিয়ে নির্জন স্থানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। রিপার আর্তচিৎকারে তার মা ঘর থেকে বের হয়ে আসামীকে ধর্ষণরত অবস্থায় দেখতে পায়। রক্তাক্ত অবস্থায় রিপাকে চ.মে.ক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ ব্যাপারে রিপার পিতা বাদি হয়ে থানায় মামলা দায়ের করেন। আদালত সরকার –পক্ষে ৯ জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে উপরোক্ত রায় প্রদান করেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে ৭ দিনের মধ্যে উচ্চতর আদালতে আপিল করা যাবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বিশেষ পিপি মোঃ ইলিয়াস মিয়া

(সংবাদ/১৮.১০.৯৭)

ধর্ষণের দায়ে বরিশালে ভন্ডপীরের দন্ড

বরিশাল, ১৬ই অক্টোবর (জেলা বার্তা পরিবেশক)। – বরিশালের প্রথম অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ মোঃ মমিনউল্লাহ মুরিদ বানানোর অজুহাতে গৃহবধূ শাহনাজ বেগম শিল্পীকে ধর্ষণের অভিযোগে ভন্ডপীর হোসেন শিয়ালীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড এবং পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে আরো দু'বছরের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেছেন।

১৯৯৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর গভীর রাতে আসামী হোসেন শিয়ালী গৌরনদী মিয়ারচর গ্রামের রাজমিস্ত্রি আঃ সালাম সর্দারের ঘরে ঢুকে তার স্ত্রী শিল্পীকে ধর্ষণ করে। ভন্ডপীর শিল্পীকে মুরিদ হবার প্রস্তাব দিলেও শিল্পী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল।

(সংবাদ/১৭.১০.৯৭)

অনেকে বলেন সমাজকে অপরাধমুক্ত করতে ও রাখতে হলে প্রয়োজনীয় শাস্তিই নিশ্চিত পথ। অপরদিকে অনেকে মনে করেন এজন্য জনগণকে অপরাধের পরিণাম যে, সমাজ এবং অপরাধী কারো জন্য কখনও ক্ষতি ছাড়া কল্যাণকর হয় না, তা নানাভাবে অবহিত রাখতে হবে। এই অবহিত প্রক্রিয়া যত ব্যাপক ও গভীর হবে ততই অপরাধ প্রবণতা হ্রাস পাবে।

কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতে আমরা বিশ্বাস করি যে, অবহিতকরণ প্রক্রিয়াকে জোরালো করার সাথে সাথে সামাজিক পরিবেশ ও অপরাধীর মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে যথাসত্বর শাস্তি দিতে হবে। তা'ছাড়া ক্ষমারও ব্যবস্থা রাখতে হবে। আরো অধিক গুরুত্ববহ বিষয় হলো আল্লাহ্‌র উপর [তাঁর সকল গুণাবলীসহ] জনমনে গভীর বিশ্বাস সৃষ্টি করা। কাজটি বড়ই কঠিন তবে অসম্ভব কিছু নয়। সকল নবী-রসূলই একাজ করেছেন এবং তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুগামীদের উপর এর দায়িত্বভার অর্পণ করে গেছেন। এ যুগেও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিষ্ঠাবান অনুগামী ইমাম মাহদী হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)ও এই মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আহমদীয়া মুসলিম জামাত একটি অবক্ষয়মুক্ত জামাত। অবক্ষয়মুক্ত সমাজকে স্থবির হলে চলে না। অবক্ষয়ের রূপ নিত্য নতুন বদলায়। সচেতন সমাজকে চাহিদামত আইন-কানুন করতে হয়। যথাসত্বর ও যথাসময়ে প্রচলিত আইন কানুনের ফাঁক-ফোকর রুদ্ধ করতে হয়। আবারও বলবো বিচার যাতে সত্বর সমাধা হয় সেদিকে সরকারকে বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ কথা কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, বিলম্বিত বিচার প্রায়ই তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে এবং তা অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণে তেমন কোন অবদান রাখতে পারে না। যেসব রায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ওসব যদি আরো দ্রুত সমাধা হতো তবে নিশ্চয় তা অপরাধপ্রবণতা দূরীকরণে অনেক বেশী কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারতো। সর্বোপরি যে বিষয়টি স্মরণীয় ও পালনীয় তা হলো আল্লাহ্ শেষ বিচারের মালিক। আল্লাহ্‌র বিচারকে ফাঁকি দেয়া বা প্রভাবিত করার কোনই সুযোগ নেই।

খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

(২১ পৃষ্ঠার পর)

করেন। অতঃপর, যে আত্মার মৃত্যু ঘটান তাহাকে রোধ করেন এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ফেরত পাঠানঃ [সূরা যুমার ঃ রুকূ ৫]।

এই আয়াত এই কথার জ্বলন্ত নিদর্শন যে, যে আত্মার মৃত্যু ঘটে, উহাকে আল্লাহ্‌তাআলা রোধ করিয়া রাখেন– অর্থাৎ, পুনরায় পৃথিবীতে পাঠান না। অন্য এক আয়াতে তিনি বলেন ঃ

"[পার্থিব জীবনের শেষে] তোমরা নিশ্চয় মরিবে। **অতঃপর, তোমাদিগকে কিয়ামতের দিনই পুনরুজ্জীবিত করা হইবেঃ** [সূরা মু'মিনূন রুকূ ১]।

এই আয়াতও স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছে যে, দৈহিক মৃত্যুর পর এ পৃথিবীতে পুনরায় জীবিত হওয়া খোদাতাআলার অমোঘ নিয়মের বিরোধী এবং মৃত ব্যক্তি আল্লাহ্‌তাআলার ওয়াদা অনুযায়ী কিয়ামতের সময় মাত্র পুনরুজ্জীবিত হইবে।

সেইরূপ, হাদীসে বর্ণিত হইয়াছে যে, হযরত জাবেরের পিতা হযরত আব্দুল্লাহ্ রাযি আল্লাহু আন্হু শহীদ হইয়া ছিলেন। তিনি খোদাতাআলার হুযূরে উপস্থিত হইলে, খোদাতাআলা তাঁহাকে বলিলেন ঃ

[তোমন্না আলা উতিকা]

"তুমি কি চাও বল, আমি তোমার আকাঙ্খা পূর্ণ করিব।

ইহাতে হযরত আবদুল্লাহ্ (রাযিঃ) পুনরায় জীবিত হইয়া পুনরায় খোদাতাআলার পথে নিহত হওয়ার আকাঙ্খা জানাইলেন। তাঁহার এই আকাঙ্খা প্রকাশ করিলে পর খোদাতাআলা বলিলেন ঃ

"আমি (বিধান) বাণী দিয়াছি ঃ যাহারা মরে, তাহারা কখনো পৃথিবীতে ফিরিয়া যাইবে না।"

অন্য কথায়, আল্লাহ্‌তাআলা তাঁহার বিধানের কারণে তাঁহার ঐ আকাঙ্খা পূর্ণ করিলেন না। অথচ তিনি অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার আকাঙ্খা পূর্ণ করিবেন। কিন্তু তিনি এরূপ আকাঙ্খা করিলেন, যাহা খোদাতাআলার পূর্বপ্রদত্ত বিধানের বিরোধী। সেইজন্য হযরত জাবের রাযি আল্লাহু আনহুর পিতার আগ্রহ খোদাতাআলা পূর্ণ করিলেন না [মিশ্‌কাত, বা'ব জামেউল মনাকেব]।

সুতরাং, মৃত ব্যক্তির পুনরায় জীবিত হইয়া পৃথিবীতে আগমন কুরআন মজীদে বর্ণিত খোদাতাআলার নির্ধারিত বিধানের বিরুদ্ধ বলিয়া মওদুদী সাহেবের এই ধারণা যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম পুনরুজ্জীবিত হইয়া পুনরাগমন করিবেন – সম্পূর্ণ অলীক। ইহা ভ্রমাত্মক কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইহার কোনই মূল্য নাই। **সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উপায়ে তিনি মুসলমানগণকে এই বৃথা কল্পনার জালে আবদ্ধ করিতে চাহিতেছেন।** এই বিষয়টি শুধু আল্লাহ্‌তাআলার শক্তি ও মহিমার উপর ন্যস্ত করা যায় না। যদিও মৃতকে জীবিত করিবার মহাশক্তি তাঁহার আছে, তবু এ পৃথিবীতে ইহার প্রকাশ তাঁহার অঙ্গীকার ও নিয়মের বিরোধী। (চলবে)

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)--হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

"আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের চিরস্থায়ী জীবন প্রাপ্তির একটি শক্তিশালী প্রমাণ হচ্ছে এই যে, তাঁর মাধ্যমে জারীকৃত স্থায়ী কল্যাণ চিরপ্রবহমান। যে ব্যক্তি এ যুগেও আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণ করে সে নিঃসন্দেহে কবর (আধ্যাত্মিক মৃত্যু) থেকে উদ্ধার লাভ করে এবং তাঁকে এক আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করা হয়।" (আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, পৃঃ ২২১)

কুরআনী জিন্দেগী

সংকলক ঃ খোন্দকার আজমল হক

(চতুর্থ কিস্তি)

৪। আল্লাহ এক-অদ্বিতীয় তিনি স্বনির্ভর স্ত্রী-সন্তানাদির উর্ধ্বে।

কুরআন

১১। তুমি বল, তিনিই আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয়,

১২। আল্লাহ্ স্বনির্ভর এবং সর্বনির্ভরস্থল।

১৩। তিনি কাকেও জন্ম দেন নাই এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয় নি, এবং তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (১১২ঃ ২-৫) 'ক'

১৫ ক। তারা বলে, 'আল্লাহ্ পুত্র সন্তান গ্রহণ করেছেন। পবিত্র তিনি । তিনি স্বয়ংসম্পূর্ণ। যা কিছু আকাশমন্ডলে আছে এবং যা কিছু পৃথিবীতে আছে তা তাঁরই। তোমাদের নিকট এর কোন প্রমাণ নেই। তোমরা আল্লাহ্র সম্বন্ধে এমন কোন কথা বলছ যার সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। (১০ঃ৬৯) 'খ'

১৫ খ। তিনিই আকাশমন্ডল ও পৃথিবীর আদি স্রষ্টা। কীরূপে তাঁর পুত্র হতে পারে যখন তাঁর কোন স্ত্রী-ই নেই, এবং তিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছেন, এবং তিনি প্রত্যেক বস্ত সম্বন্ধে সর্বজ্ঞানী ? (৬ঃ১০২)

হাদীস

৭। হযরত আবূহুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "আল্লাহ্তাআলা বলেনঃ আদম সন্তান আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে, অথচ তার জন্য এটা উচিত ছিল না এবং সে আমাকে মন্দ বলেছে অথচ এটাও তার জন্য উচিত ছিল না। আমাকে তার মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হল এই বলে ঃ আল্লাহ্ কখনও আমাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন না যেভাবে আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছেন। অথচ আমার পক্ষে প্রথম বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা (কোন অংশেই) সহজ ছিল না (অর্থাৎ পুনর্বারের সৃষ্টি দ্বিতীয় বারের অপেক্ষা সহজ)। আর আমাকে মন্দ বলা হল এই যে, তারা বলে আল্লাহ্ সন্তান পরিগ্রহণ করেছেন, অথচ আমি এক-অদ্বিতীয়, সকলের আশ্রয়স্থল, সকলেই আমার মুখাপেক্ষী। আমি কোন সন্তান জন্ম দেই নি, আমি কারো জাত নই এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর রেওয়ায়াতে আছে, আমাকে আদম সন্তানদের মন্দ বলা হল এই যে, তারা বলে আমার সন্তান আছে, অথচ আমি স্ত্রী বা পুত্র হতে পবিত্র" (বুখারী)।

মালফুযাত

৪। "স্মরণ রাখতে হবে আল্লাহ্তাআলার তৌহীদ (একত্ব) সম্বন্ধে সঠিক বিশ্বাস রাখা এবং এতে কমবেশী না-করা এ সেই বিচার যা মানুষ তার মালিকের সম্বন্ধে পালন করে থাকে। এ সকল শিক্ষা নৈতিক শিক্ষার অন্তর্গত বা কুরআন শরীফের শিক্ষায় সন্নিবেশিত হয়েছে" (ইসলামী নীতি-দর্শন)।

৫। "তিনি (আল্লাহ্) কারও পুত্র নন এবং কেউই তাঁর পুত্র নয়। তিনি স্বনির্ভর। তাঁর কোন পিতা বা পুত্রের প্রয়োজন নেই। এটাই তৌহীদ যা কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় এবং যা আমাদের বিশ্বাসের মূলঃ (লেকচার সিয়ালকোট)।

৬। "তিনি সেই ওয়াহেদ লা-শরীক খোদা, যাঁর কোন পুত্র বা স্ত্রী নেই। তিনি সেই অনুপম খোদা যাঁর কোন দ্বিতীয় নেই" (আল্ওসীয়্যত পৃঃ ১৫)।

'ক' ৬ঃ৪; ১৩ঃ১৭; ১৪ঃ৪৯; ৩৫ঃ১৬; ৩৮ঃ৬৬; ৩৯ঃ৫;

'খ' ৬ঃ১০১; ১০ঃ৭০; ১৭ঃ৪১; ১১২; ১৮ঃ৫-৬; ১৯ঃ৩৬; ২১ঃ২৭; ২৫ঃ৩; ৩১ঃ১৩, ২৭; ৩৭ঃ১৫০-১৬০; ৩৯ঃ৫; ৪৩ঃ২০, ৮২-৮৩; ৭২ঃ৪-৫;

৫। আল্লাহ্র একত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্র সাক্ষ্য। সাক্ষী হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট।

কুরআন

১৬। আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানীগণও ন্যায়ের উপর কায়েম হয়ে (এই সাক্ষ্য দেয়), তিনি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই, যিনি মহাপরাক্রমশালী পরম প্রজ্ঞাময়।(৩ঃ১৯) 'ক'

১৭। তুমি বল, 'আমার ও তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্ই সাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট, নিশ্চয় তিনি তাঁর বান্দাগণকে উত্তমরূপে জানেন ও দেখেন'। (১৭ঃ৯৭) 'খ'

প্রকৃতির মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ও তর্কাতীত বিষয়, যা প্রতিটি সত্যধর্মেরও মৌলিক নীতি, তাহ'ল আল্লাহ্র একত্ব। সমস্ত সৃষ্টি ও তার মাঝে বিরাজমান পরিপূর্ণ শৃঙ্খলা-সঙ্গতি এই মৌলিক সত্যকেই আমাদের নিকট তুলে ধরে। ফিরিশ্তাগণ, যাঁরা আল্লাহ্র বাণী বহন করে নবীগণের নিকট পৌছে দেন, (যারা বহু অত্যাচার – অনাচার সহ্য করেও নিঃস্বার্থভাবে বিশ্বের মাঝে সেই আল্লাহ্র বাণী ছড়িয়ে দেন) এবং সব সৎলোক যারা নবীর কাছ হতে আল্লাহ্র বাণী পেয়ে নিজের জীবনে, তা বাস্তবায়ন করে চতুর্দিকে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন, তারা সকলেই আল্লাহ প্রদত্ত সাক্ষ্যের সাথে নিজেদের সাক্ষ্য মিলিয়ে একবাক্যে বলে উঠেন, "আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়।ঃ তেমনিভাবে সকলেই একযোগে আল্লাহ্র অংশীদারীত্ব ও সমকক্ষতাকে মিথ্যা সাবস্ত করে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বহুত্ববাদ, ত্রিত্ববাদ ও দ্বিত্ববাদ সর্বৈব মিথ্যা (কুরআন মজীদ টীকা - ৩৮২)।

হাদীস

৮। হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, "যে সকালে উঠে বলবে, ' হে আল্লাহ্', ! আমি সকালে সাক্ষী করি তোমাকে এবং তোমার আরশবহনকারী ফিরিশ্তাদেরকে, তোমার অপর ফিরিশ্তাদেরকে, তোমার সমস্ত সৃষ্টিকে; তুমিই আল্লাহ্ তুমি ব্যতীত কোন মাবূদ নেই ; তুমি এক-অদ্বিতীয়, তোমার কোন শরীক নেই এবং মুহাম্মদ (সাঃ) তোমার বান্দা ও রসূল।' নিশ্চয় আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন তার ঐদিনে যে গোনাহ্ হবে। আর যদি সন্ধ্যায় বলে, তবে আল্লাহ্ মাফ করে দিবেন তার ঐ রাত্রে যে গোনাহ্ সংঘটিত হবে" (তিরমীযি, আবুদাউদ)।

মলফুযাত

৭। "পবিত্র কুরআন হতে জানা যায় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ এক, তাঁর কোন শরীক নেই এবং সকল ত্রুটিমুক্ত। তিনি সকল পূর্ণ গুণাবলীর অধিকারী এবং সকল শক্তির বিকাশ তাঁর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেন এবং সকল বিষয় তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়। তিনি সকল আশীষের উৎস এবং জাযা ও সাজার বিচারকও তিনি" (ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মের সহিত তার তুলনা)।

'ক' ১১ঃ১৫;

'খ' ৪ঃ৩৪, ১৬৭; ৬ঃ২০; ১৩ঃ৪৪; ২৯; ৪৬ঃ৯; ৮ঃ২৯; ৫৩; ৫৮ঃ৭; ৮৫ঃ১০;

(চলবে)

রোযা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য

মূল : মোহতারম আব্দুল মাজেদ তাহের, লন্ডন ❑ অনুবাদ-মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

রোযা কার জন্যে ফরয?

রমযানের রোযা প্রত্যেক বালেগ, বুদ্ধিমান, সুস্থদেহী, মুকীম (ভ্রমণের অবস্থায় নয় এমন ব্যক্তি, যিনি বাড়ীতে অবস্থান করছেন -অনুবাদক) মুসলমান পুরুষ ও মহিলার জন্যে ফরয বা অবশ্য-করণীয়। ভ্রমণকারী ও রোগীদের জন্যে এ অবকাশ রয়েছে যে, তারা অন্য দিনে ঐ রোযাগুলো পুরো করবে যেগুলো তারা রাখতে পারেনি। চিররোগী যারা, যাদের স্বাস্থ্য ফিরে পাবার কোন আশা নেই অথবা যারা এমন দুর্বল বা যারা এত দুর্বল যে পরেও রোযা রাখার শক্তি ফিরে পাবার যাদের সম্ভাবনা নেই, প্রসূতী (বাচ্চাকে দুধ পান করায় এমন মহিলা) এবং গর্ভবতী যারা ক্রমাগতভাবে ঐ অসুবিধায় নিপতিত থাকে এমন অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তিবর্গ সামর্থ্যানুযায়ী রোযার বদলে ফিদিয়া দিবে (ফিদিয়ার ব্যাপারে পরে আলোচনা করা হচ্ছে)।

রোযা রাখার বয়স ঃ

হযরত ইমাম বুখারী (রহঃ) 'বাবু সাওমুস্ সাবিয়্যান' অর্থাৎ বালক-বালিকাদের রোযা প্রসঙ্গে আলাদা অধ্যায়ের সংযোজন করেছেন আর এর মধ্যে হযরত উমর (রাঃ)-এর বক্তব্যের উল্লেখ করেছেন, যা তিনি এক মাতাল ব্যক্তিকে বলেছিলেন– "ওয়ায়িলাকা ওয়া সাবিয়্যানানা সিয়ামুন ফা যারাবাহু" অর্থাৎ তুই ধ্বংস হ! আমাদের শিশুরা রোযা রাখছে আর তুই কিনা মদ গিলেছিস? সুতরাং তাকে বেত মারা হলো।

রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরাহ্ (দশই মহররম)-এর রোযা প্রসঙ্গে রেওয়ায়াত করতে গিয়ে হযরত রুবাইয়ে বিনতে মু'আওয়েজ বর্ণনা করেন, "আমরা এ রোযা রাখতাম এবং বাচ্চাদের দ্বারাও রাখাতাম এবং তাদেরকে হাসি-খুশী রাখা ও খেলা-ধূলায় নিয়োজিত রাখার জন্যে তূলার এক প্রকার খেলনা (বল জাতীয় খেলনা) তৈরী করে দিতাম এবং যখন তাদের খাবার সময় হোত তখন তারা কান্নাকাটি করলে খেলনা দিয়ে দিতাম আর এভাবে ইফতারের সময় পর্যন্ত তাদের ব্যস্ত রাখতাম" (বুখারী কিতাবুস্ সাওম, বাবু সাওমুস্ সাবিয়্যান)।

এই যে রোযা, যার মধ্যে বাচ্চাদের কঠোরতার সাথে রোযা রাখানোর ব্যাপারটি বর্ণিত হয়েছে তা রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বের বিষয়। ইতোপূর্বে শরীয়তের বিধান মতে সারা বছরে কেবল একদিন রোযা রাখা হোত যা কিনা তুলনামূলকভাবে বেশী বয়সের বাচ্চাদের দ্বারা রাখিয়ে নেয়া হোত। প্রকৃতপক্ষে বেশী বয়সের বাচ্চাদের দ্বারা এরূপ এক আধটি রোযা রাখিয়ে নেয়া কোন দোষ মনে করা হোত না।

☆...হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) রোযা রাখার বয়স সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন :

"কেউ আছে যারা ছোট বাচ্চাদের দ্বারা রোযা রাখান, যদিও প্রত্যেকটি ফরয ও আদেশের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সীমা নির্ধারিত ও ভিন্ন ভিন্ন সময় হয়ে থাকে। আমাদের নিকট কোন কোন আদেশ-নিষেধের সময় চার বছর বয়স থেকে আরম্ভ হয় এবং কতক আদেশ-নিষেধ এ রকম যার সময় সাত বছর থেকে বার বছর নির্ধারিত আর কতক এ রকম যার সময় ১৫ থেকে ১৮ বছর পর্যন্ত বয়সের যুবকদের ওপরে আরোপিত হয় এবং ইহাই সাবালকত্বের সীমারেখা। ১৫ বছর বয়স থেকে রোযা রাখার অভ্যেস করানো দরকার আর ১৮ বছর বয়স থেকে রোযা ফরয মনে করা উচিত। আমার মনে আছে যে, যখন আমরা ছোট্ট ছিলাম আমাদেরও রোযা রাখার শখ হোত কিন্তু মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আমাদের রোযা রাখতে দিতেন না। আর আমাদের রোযা রাখার ব্যাপারে কোন প্রকার নির্দেশ দেয়া পসন্দ করা ব্যতিরেকে সর্বদা আমাদের ওপরে প্রভাব খাটাতেন। তাই বাচ্চাদের শরীরকে সুস্থ রাখতে এবং তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে রোযা রাখা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা উচিত। এর পরে যখন তাদের জন্যে সময় হয়ে যায়, যখন তারা নিজেদের পূর্ণ শক্তিতে পৌঁছে যায়, যখন ১৫ বছরের সময়কাল এসে যায় তখন তাদের দ্বারা রোযা রাখানো হোক আর তা-ও ধীরে সুস্থে। প্রথম বছর যে কয়টি রাখে পরবর্তী বছর তাথেকে অধিক এবং তার পরবর্তী বছর তাথেকে অধিক এবং তার পরবর্তী বছর তাথেকে অধিক রাখানো হোক। এভাবে ক্রমাগত তাদেরকে রোযায় অভ্যস্ত করা দরকার" (আল্ ফযল, ১১ই এপ্রিল, ১৯২৫ ইং)।

☆....হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন,

"সাধারণতঃ ইহা দেখা যায় যে, মায়েরা তাদের বাচ্চাদের ওপরে এ ব্যাপারে দয়া দেখান, বলেন, তাদের বয়স কম এজন্যে রোযা রাখতে দেয়া হয় না। কখনও শিশুরা অধিক উৎসাহ দেখায় কিন্তু মায়েরা তাদেরকে শক্তি প্রয়োগে বিরত রাখে। ইহা ঠিক কথা যে, বাচ্চাদের জন্যে রোযা ফরয নয় কিন্তু শৈশবকাল থেকেই যখন বাচ্চারা নামায পড়া আরম্ভ করে যদি তাদেরকে রোযার আদব-কায়দাগুলো শিখানো হয়, তাদেরকে রোযা রাখার দৃষ্টান্ত না দেখানো হয় অর্থাৎ তাদেরকে রোযা রাখার ব্যাপারে কিছু কিছু অভ্যস্ত করা না হয় তাহলে যখন তারা সাবালক হয় তখন তাদের মধ্যে রোযার মাহাত্ম্য জাগ্রত থাকে না। আমাদের তো মনে আছে যে, কাদিয়ানের যুগে খোদার অনুগ্রহে যখন রোযার মান বড়ই উন্নত ছিলো তখন বিনা অসুবিধায় কোন আহমদী রোযা পরিত্যাগ করতেন না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর শিক্ষার খুব প্রভাব ছিলো। এজন্যে ঐ যুগে কেউ বলতে পারতো না যে, আহমদীরা রোযার ব্যাপারে দুর্বল। ঐ সময়ে এই নিয়ম ছিলো যে, শৈশবকাল থেকেই মায়েরা ঘরে শিক্ষা দিতেন, এবং দশ বছর বয়সেই বাচ্চারা রোযা রাখা আরম্ভ করে দিতো। তদুপরি সাবালক বলতে ইংরেজ কর্তৃক নির্ধারিত সাবালকত্বের বয়সসীমার কথা বলা হয়নি। অর্থাৎ ইহা হোত না যে, ইংরেজরা বলে দিলো ২১ বছর বয়সে সাবালক হবে অমনি ২১ বছর বয়সে সাবালক হবে আর ২১ বছর বয়স শরীয়তে ফরয হবে অথবা ইংরেজরা বলে দিলো ১৮ বছর নির্ধারিত করে দাও তাহলে ১৮ বছর বয়সের পরে শরীয়তে ফরয হবে। বরং মানবীয় পরিভাষায় এবং সাধারণ জ্ঞানে যখনই মানুষ সাবালক হতো তখন তারা পুরো রোযা রাখার চেষ্টা করতো। রোযা রাখার ব্যাপারে সাবালকত্ব প্রসঙ্গে ফকীহ্গণের মধ্যে কিছু মতভেদও পরিদৃষ্ট

হয়। বাচ্চাদের দৈহিক বিকাশের প্রেক্ষাপটে কতক ফকীহ তুলনামূলকভাবে নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গী পেশ করেছেন। এজন্যে এ প্রসঙ্গেও অসাধারণ কঠোরতা করা হোত না। বরং মনোরঞ্জনের দিকে লক্ষ্য রেখে চেষ্টা করা হোত যে, যেসব বাচ্চা সাবালক হয়েছে অর্থাৎ ১৩-১৪ বছর বয়সে পদার্পণ করেছে, চেষ্টা করা হোত যে, তারা যেন বেশী বেশী রোযা রাখে। এসব বাচ্চারা যখন বেশী বয়সে পৌঁছে যেতো অর্থাৎ ১৮-১৯ বছর বয়সে পদার্পণ করতো তখন থেকে তারা অবশ্যই রমযানের পুরোপুরি রোযা রাখা আরম্ভ করতো" (খুৎবা জুমুআ, ৩০-৫ ১৯৮৬ ইং)।

রুগ্ন ব্যক্তি ও ভ্রমণকারী রোযা রাখবে না ঃ

আল্লাহ্তাআলা কুরআন করীমে বলেন, ফামান কানা মিনকুম মারীযান আও 'আল্ সাফারিন ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার–ওয়া 'আলাল্লাযীনা ইউত্বীকূনাহু ফিদ্ইয়াতুন ত্বা'আমু মিসকীন" অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি রুগ্ন থাকে বা ভ্রমণে থাকে তাহলে তাকে অন্য দিনে এ সংখ্যা পুরো করতে হবে আর ঐসব লোক যাদের পক্ষে ইহা অর্থাৎ (রোযা রাখা) ক্ষমতাতীত, তাদের জন্যে ফিদিয়া একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করা (সূরা বাকারাহ্ : ১৮৫ আয়াতাংশ)

আল্লাহ্তাআলার সন্তুষ্টিতে পুণ্য নিহিত :

✵... হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) বলেন,

"পুণ্য কেবল সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত, দৈহিক কঠোরতার সাথে নয়। আর রোযার মধ্যেও দৈহিক কঠোরতা খোদার দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখে না। আরও অনেক কথা আছে যা দৃষ্টিতে রাখা উচিত কিন্তু কষ্ট দেয়া খোদার দৃষ্টিতে নেই। অতএব যখন খোদা বলেন যে, পরিত্যাগ করো তখন পরিত্যাগ করা উচিত। যখন খোদা বলেন, রাখো তখন রাখা উচিত। সুতরাং তিনি বলেন, "মান কানা মিনকুম মারীযান" যারা রুগ্ন, "আও 'আলা সাফারিন" অথবা ভ্রমণরত," "ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার" তাহলে পরে রমযান মাসে রোযা রাখবে না পরে রেখে নিবে। "ইউরীদুল্লাহু বিকুমুল ইউসরা ওয়ালা ইউরীদু বিকুমুল 'উসরা"–এ ধারণার বশবর্তী হয়ো না যে, কঠোরতা আরোপ করলে খোদা বেশী খুশী হবেন। নিজের প্রাণকে কষ্টে নিপতিত করলে পরে আল্লাহ্ খুব সন্তুষ্ট হবেন। কষ্টে তুমি নিপতিত হয়েছো। আল্লাহ্ তো চান তোমার জন্যে স্বাচ্ছন্দ্য, কঠোরতা চান না.....অতএব খোদার ব্যাপক দৃষ্টির সম্মুখে মাথা ঝুঁকিয়ে দাও। আল্লাহ্ যান চান, যতটুকু কঠোরতা অর্পণ করেন, উহাকে গ্রহণ করো। এথেকে আগে বেড়ে গিয়ে শক্তি প্রয়োগ দ্বারা আপনি খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পারেন না" (খুৎবা জুমুআ, ১৯-১-১৯৯৬ ইং)।

ভ্রমণে রোযা রাখা পুণ্যের কাজ নয় :

✵....**হযরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ্ (রা:) বর্ণনা করেন যে, একবার ভ্রমণে আঁ হযরত (সাঃ) নিজের সঙ্গীদের একটি দলকে** দেখতে পেলেন যার মধ্যে এক ব্যক্তির ওপরে ছায়া দেয়া হচ্ছিলো। হুযূর (সাঃ) কারণ জিজ্ঞেস করলে বলা হলো যে, রোযাদারকে ছায়া দেয়া হচ্ছে। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বড়ই প্রতাপের সাথে বল্লেন, "লায়সা মিনাল বিররিস্ সাওমি ফিস্ সাফরি" অর্থাৎ ভ্রমণে রোযা রাখার মধ্যে পুণ্য নেই।

(বুখারী কিতাবুস্ সাওম বাবু কওলুন্নাবী লিমান যুল্লিলা আলায়হি ওয়াশতাদ্দাল হাররা লায়সা মিনাল বির্রিস্ সাওমি ফিস্ সাফ্রি)।

✵...এভাবেই আরও একটি ঘটনা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হুযূর (সাঃ) এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন যার ওপরে পানির ছিঁটা দেয়া হচ্ছিলো। হুযূর (সাঃ) সাহাবা (রাঃ)-কে প্রেমভরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের সঙ্গীর কী হয়েছে? তারা বল্লেন, (ঐ ব্যক্তি) রোযাদার। আঁ হযরত (সাঃ) বল্লেন, ইহা পুণ্যের কথা নয় যে, তোমরা ভ্রমণে রোযা রাখো। তোমাদের জন্যে আল্লাহ্তাআলা প্রদত্ত অবকাশ থেকে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত যা তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন। অতএব এ অবকাশকে গ্রহণ করো" (সুনানে নিসাঈ কিতাবুস্ সাওম)।

✵... আঁ হযরত (সাল্লাঃ) স্বয়ং ভ্রমণকারীদের রোযা ভাঙ্গাতেন উমরু বিন উম্মিয়া যমরী বর্ণনা করেন, আমি আঁ হযরত (সাঃ)-এর সেবা করার জন্যে এক ভ্রমণে তাঁর সাথে ছিলাম। হুযূর (সাঃ) বল্লেন, "হে আবূ উম্মিয়া! খাবার অপেক্ষা করো", আমি বললাম, হুযূর (সাঃ) আমি তো রোযা রেখেছি। তিনি আদর করে বল্লেন, এদিকে আমার নিকটে এস, তোমাকে বলছি যে, আল্লাহ্তাআলা ভ্রমণকারীকে রোযা রাখা থেকে অবকাশ দিয়েছেন এবং অর্ধেক নামাযও তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন" (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস্ সাওম)।

✵...সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম ভ্রমণে রোযা রাখতেন না বরং রোযা রাখা দোষের মনে করতেন।

✵....হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ বলেছেন যে, "রমযানে ভ্রমণকালে রোযাদার (খোদার আদেশ অমান্য করার দিক থেকে) ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে ঘরে থেকে (বিনা কারণে) রোযা রাখেনি"(সুনানে ইবনে মাজাহ্)।

✵... মুহাম্মদ বিন কা'আব বর্ণনা করেন যে, রসূল করীম (সাঃ)-এর খাদেম হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ)-এর নিকট আমি একবার রমযান মাসে আসলাম, তিনি ভ্রমণে যাচ্ছিলেন। যান-বাহন তৈরী ছিলো। তিনি খাবার আনিয়ে খেলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইহা কি রসূল করীম (সাঃ)-এর সুন্নত ও রীতি। তিনি বল্লেন, হ্যাঁ। ইহা সুন্নত। এর পরে তিনি ভ্রমণে রওয়ানা দিয়ে গেলেন (সুনানে তিরমিযী)।

✵... সাহাবা কেরামের পরে তাবেঈনদেরও এই রীতি ছিলো যে, তারা ভ্রমণে রোযা রাখতেন না এবং ভ্রমণকারীর রোযা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে থাকতেন।

✵... বিখ্যাত তাবেঈ আবূ ক্বলাবা উন্নতমানের আলেম ছিলেন। এক বিদেশ যাত্রায় তাঁর সাথে কোন এক ব্যক্তি সঙ্গী ছিলেন। যখন খাবার সময় আসলো তখন তিনি বল্লেন, "আমি রোযা রেখেছি।" আবূ ক্বলাবা বল্লেন, "আল্লাহ্তাআলা ভ্রমণকারীর অর্ধেক নামায মাফ করে দিয়েছেন এবং ভ্রমণে রোযার ব্যাপারে অবকাশ দিয়েছেন। এজন্যে তুমি আমার সাথে খাবার খেয়ে নাও এবং রোযা ভেঙ্গে ফেল। সুতরাং ঐ ব্যক্তি তার সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করলো" (সুনানে নিসাঈ, কিতাবুস্ সাওম)।

✵...হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রাঃ) লেখেন, "আমার নিকট আব্দুল্লাহ্ সানূরী (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, প্রাথমিক দিকের কথা, একবার রমযান মাসে কোন একজন অতিথি এখানে হযরত সাহেবের নিকট আসলেন। ঐ সময় সে ব্যক্তি রোযাদার ছিলেন। আর দিনের অধিকাংশই অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিলো,

বরং সম্ভবতঃ আসরের পরের কথা। হযরত সাহেব (আঃ) তাকে বল্লেন, 'আপনি রোযা ভেঙ্গে ফেলুন', তিনি আবেদন করলেন, 'এখন তো অল্প সময়ই রয়ে গেছে, এখনকি রোযা ভাঙ্গবো?' হুযূর(আঃ) বল্লেন, **"আপনি কি জোর করে খোদাকে সন্তুষ্ট করাতে চান? খোদাতাআলা জোর জবরদস্তিতে নয় আনুগত্যে সন্তুষ্ট হন।** যখন আল্লাহ্ বলেছেন, 'ভ্রমণকারী যেন রোযা না রাখে, তাহলে রাখা উচিত নয়।' এতে তিনি রোযা ভেঙ্গে ফেলেন" (সীরাতুল মাহদী, প্রথম খণ্ড, ১৭৭ রেওয়ায়াত)।

✯... এভাবে তিনি লেখেন যে,

"হযরত ডাক্তার মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল সাহেব (রাঃ) আমার নিকট বর্ণনা করেন যে, একবার লাহোর থেকে কতিপয় বন্ধু রমযানে কাদিয়ান আসলেন। হযরত সাহেবের নিকট খবর পৌঁছলে তিনি কিছু নাস্তা নিয়ে মসজিদে তাদের সাথে দেখা করতে আসলেন। এসব বন্ধু জানালেন যে, তারা সবাই রোযা রেখেছেন। তিনি (আঃ) বল্লেন, 'ভ্রমণে তো রোযা রাখা ঠিক নয়। আল্লাহ্তাআলা প্রদত্ত অবকাশের ওপরে আমল করা দরকার। সুতরাং নাস্তা করিয়ে তাদের রোযা ভাঙ্গালেন" (সীরাতুল মাহদী, ২য় খণ্ড, ৩৭৮ রেওয়ায়াত)।

✯... হযরত মুন্সী যাফর আহমদ সাহেব বর্ণনা করেন যে,

"রমযান মাসে কাদিয়ানে এক বন্ধু বেড়াতে আসলেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) অন্দর থেকে শরবত চেয়ে আনালেন। তখন ঐ বন্ধুটি নিবেদন করলেন যে, তিনি রোযা রেখেছেন। হুযূর (আঃ) রোযা ভাঙ্গালেন এবং ছ'জন খাদেমকে আদেশ দিলেন যে, মসজিদে আকসার কূয়ার নিকট তাকে নিয়ে যাও এবং তাকে গোসল করিয়ে দাও এবং মাথায় কমপক্ষে ১০০ ঘটি পানি ঢালো। সুতরাং হুযূর (আঃ)-এর নির্দেশ পালন করা হোল। ঐ বন্ধু বলেন যে, যখন তার মাথায় পানি ঢালা হচ্ছিলো তখন তার এ রকম মনে হচ্ছিলো যে, তার শরীর থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। পরের দিন খবর পাওয়া গেল যে, দু'জন ভ্রমণকারী প্রচণ্ড গরম ও পিপাসার কারণে রোযার অবস্থায় প্রাণত্যাগ করেছে কিন্তু তারা রোযা ভাঙ্গেনি"।

✯... হযরত আকদস মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হোল যে, ভ্রমণে রোযা রাখার ব্যাপারে আদেশ কী? এতে তিনি (আঃ) বল্লেন,

"কুরআন করীম থেকে তো ইহা জানা যায় যে, 'ফামান কানা মিন্কুম মারীযান আও 'আলা সাফারিন ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার'–অর্থাৎ রোগী ও ভ্রমণকারী যেন রোযা না রাখে। এতে আদেশ নিহিত। আল্লাহ্তাআলা ইহা বলেননি যে, যার খুশী না রাখুক। আমার মতে ভ্রমণকারীর রোযা রাখা উচিত নয়। যেহেতু সাধারণভাবে অধিকাংশ লোক রেখে নেয়, এজন্যে যদি আদেশ পালন মনে করে কেউ রেখে নেয় তাতে দোষ নেই, কিন্তু 'ফা'ইদ্দাতুম্মিন আইয়্যামিন উখার'–এর প্রতিও তাহলে দৃষ্টি দিতে হবে। ভ্রমণে কষ্ট স্বীকার করে যদি কেউ রোযা রাখে তাহলে এতদ্বারা ইহা মনে হয় যেন জোরজবরদস্তি করে খোদাতাআলাকে সন্তুষ্ট করতে চায়, আদেশ মান্য করা দ্বারা তাঁকে খুশী করতে চায় না। ইহা ভুল। আল্লাহ্তাআলার আদেশ-নিষেধ পালনের মধ্যেই সত্যিকারের ঈমান নিহিত" (আল্ হাকাম, ২৬-১-১৮৯৯ইং)।

✯... আরও একটি ঘটনায় তিনি (আঃ) বলেন,

"যদি রেলের ভ্রমণ হয়, কোন প্রকারের কষ্ট না হয় তাহলে রেখে নিন, নচেৎ খোদাতাআলা প্রদত্ত অবকাশ থেকে উপকৃত হোন" (আল্ হাকাম, ২৪-১২-১৯০০)।

✯... পুনরায় আরও এক উপলক্ষ্যে হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন,

"যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং ভ্রমণের অবস্থায় রমযান মাসে রোযা রাখে সে খোদাতাআলার সুস্পষ্ট আদেশ অমান্য করে। খোদাতাআলা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, রোগী এবং ভ্রমণকারী রোযা রাখবে না। রোগী সুস্থ হলে এবং ভ্রমণকারীর ভ্রমণ শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এ আদেশ পালন করা উচিত। কেননা, মুক্তির সম্পর্ক আশিসের সাথে আর নিজের কর্মের জোরে কোন ব্যক্তি মুক্তি লাভ করতে পারে না। খোদাতাআলা ইহা বলেননি যে, অসুখ কম হোক বা বেশী, আর ভ্রমণ দীর্ঘ হোক বা ছোট বরং আদেশটি সাধারণ, আর এর ওপরে আমল করা উচিত। রোগী ও ভ্রমণকারী যদি রোযা রাখে তাহলে তাদের ওপরে আদেশ অমান্যের বিধি বলবৎ হবে" (আল্ বদর ১৭-১০-১৯০৭ইং)।

কতক রোগ এমনও হয় যে, মানুষ তা নিয়ে নিজের সকল কাজকর্ম সম্পাদন করে থাকে। এমন লোককে রোগী মনে করা হয় না। আবার এমন লোকও আছে যে, চাকরীর কারণে তার ভ্রমণ করা জরুরী। ইহাকে ভ্রমণ হিসেবে ধরা যায় না। এ ভ্রমণ তো চাকুরীর অংশ। এভাবে কতক রোগ আছে যা নিয়ে মানুষ সমস্ত কাজকর্ম করে থাকে। সেনাবাহিনীর মধ্যে এমন হয় যে, যারা রোগে নিপতিত অথচ সমস্ত কাজকর্ম করে। কয়েকদিনের আমাশার কথাই ধরা যাক না কেন, সব সময়ের জন্যে কাজকর্ম ছেড়ে দেয় না। যদি অন্য কাজের জন্যে সময় করা যায় তাহলে কি কারণে এমন রোগী রোযা রাখবে না? এসব বাহানা কেবল এ কারণেই হয়ে থাকে যে, এসব লোক আসলে রোযা রাখারই পক্ষপাতি নয়। নিঃসন্দেহে ইহা কুরআনের আদেশ যে, ভ্রমণের অবস্থায় এবং এমনিভাবে অসুস্থাবস্থায় রোযা রাখা উচিত নয় আর আমরা এর ওপরে জোর দিই যে, যেন কুরআনের আদেশের অমর্যাদা করা না হয়, কিন্তু এ বাহানা থেকে উপকৃত হয়ে যেসব লোক রোযা রাখতে পারে অথচ রোযা রাখে না বা তাদের কিছু রয়ে গেছে কিন্তু যদি তারা চেষ্টা করে তাহলে ওগুলোকে পুরো করতে পারে অথচ পুরো করার চেষ্টা করে না এমতাবস্থায় তারা তেমনই পাপ করে যেভাবে কেউ রমযান মাসে বিনা কারণে রোযা না রেখে পাপ করে। এজন্যে প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য যে, যেসব রোযা সে অমনোযোগিতার কারণে বা শরীয়ত কর্তৃক সিদ্ধ কারণে রাখতে পারেনি উহা যেন সে পরে পুরো করে" (আল্ ফযল, ১৬-৮-১৯৪৮ ইং)।

অতএব ঐসব লোক যাদের ডিউটিই ভ্রমণ সম্পর্কিত; যেভাবে রেলওয়ে গার্ড, ড্রাইভার, পাইলট, ট্রাভেল এজেন্ট দৈনন্দিন নিজেদের কাজে ভ্রমণ করেন, এরা সবাই মুকীমদের অনুরূপ এবং রমযানের রোযা রাখবে।

(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল-এর ২৬ ডিসেম্বর '৯৭ তারিখের সংখ্যার সৌজন্যে।)

(চলবে)

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)-এর সালাম

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ন্যাশনাল আমীর সাহেবের এক পত্রের জবাবে বলেছেন, আল্হামদুলিল্লাহ্। আল্লাহুম্মা যিদ ও বারিক। সমস্ত জামা'ত আমার ভালবাসাপূণ সালাম ও রমযানের মোবারকবাদ গ্রহণ করুন এবং দোয়ার দরখাস্ত করছি।

স্বাক্ষরিত / মির্যা তাহের আহমদ
খলীফাতুল মসীহ্ রাবে'

ওয়াকফে জাদীদের সেক্রেটারী

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) গত ২রা জানুয়ারী '৯৮ জুমুআর খুৎবায় প্রত্যেক জামাতের নব-দীক্ষিত আহমদী ভাই-বোনকে ওয়াকফে জাদীদের অধীনে এনে সঠিক তালীম-তরবীয়ত প্রদান এবং ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণ করানোর জন্যে, তা যত কম বা বেশী হোক না কেন, প্রত্যেক জামাতে আরও একজন সেক্রেটারী নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন। সকল জামাতের আমীর / প্রেসিডেন্ট সাহেবকে এ কাজের জন্যে একজন কর্মদক্ষ লোককে সেক্রেটারী ওয়াকফে জাদীদ (নও মোবাইন) হিসেবে মনোনয়ন দিয়ে খাকসারের অনুমোদনের জন্যে পাঠাতে বলা হচ্ছে। হুযূর (আইঃ)-এর নির্দেশ যাতে সত্বর পালিত হয় সেজন্যে সত্বর ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ওয়াককে জাদীদের ওয়াদা

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) ওয়াকফে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা করেছেন। সুতরাং সমগ্র জামাত'কে নতুন বছরের ওয়াদার তালিকা (নতুনদের আলাদা) প্রনয়ণ করে সত্বর পাঠাতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। বকেয়া চাঁদা আদায়ের প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। এখানে আরও উল্লেখ্য, যারা নতুন বছরের তাহরীকে জাদীদ ও ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা ২৫ রমযানের মধ্যে আদায় করে দিবেন তাদের নাম হুযূর (আইঃ)-এর খেদমতে দোয়ার জন্যে পেশ করা হবে।

ফিতারানা ও ফিদিয়া

এ বছর ফিতরানা ধার্য করা হয়েছে ৩২/= (বত্রিশ) টাকা (যারা অপারগ তারা অর্ধেক হারে দিতে পারেন) এবং ফিদিয়া ধার্য করা হয়েছে শহরের জামাতগুলোর জন্যে ৬০০/= (ছয়শত) টাকা এবং গ্রামের জামাতগুলোর জন্যে ৪৫০/= (চারশত পঞ্চাশ) টাকা। এ প্রসঙ্গে সত্বর যথাযথ ব্যবস্থা নিয়ে রিপোর্ট পেশ করার জন্যে বলা হচ্ছে।

বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদর -এর অনুমোদন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) গত ৭ ডিসেম্বর '৯৭ বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্র সদর হিসেবে মোহতরম মাকসুদা রহমান সাহেবাকে সদয় অনুমোদন দান করেছেন। সকলের অবগতি, দোয়া ও সহযোগিতার উদ্দেশ্যে এলান করা যাচ্ছে।

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

সীরাতুন্নবী জলসা

মাহিগঞ্জ – গত ২৭ ডিসেম্বর '৯৭ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জের উদ্যোগে ভাবগম্ভীর পরিবেশে সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা উদযাপিত হয়।

বার্ষিক ইজতেমা

বগুড়া – গত ২৬ ডিসেম্বর '৯৭ বগুড়া মসজিদে সফলতার সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্র প্রথম বার্ষিক ইজতেমা '৯৭ অনুষ্ঠিত হয়। ইজতেমায় নাসেরাত ও লাজনাসহ ৪০ জন অংশ গ্রহণ করে। উক্ত ইজতেমার যৌথ উদ্যোক্তা ছিল লাজনা ইমাইল্লাহ্, বগুড়া ও নিউ সোনাতলা।

নারায়ণগঞ্জ – গত ২০ ডিসেম্বর '৯৭ শনিবার লাজনা ইমাইল্লাহ্, নারায়ণগঞ্জের উদ্যোগে স্থানীয় মসজিদ প্রাঙ্গণে ৫ম বার্ষিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ইজতেমায় ৮০ জন লাজনা ও ৪০ জন নাসেরাত উপস্থিত ছিলেন।

সন্তান লাভ

● আল্লাহ্তা'লার অশেষ রহমত ও ফযলে গত ৩ ডিসেম্বর '৯৭ আমার বোনের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আলহামদুলিল্লাহ্। নবজাতক দিনাজপুর জামাতের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মরহুম হামীদ হাসান খান এবং মজলিস আনসারুল্লাহ্র বিভাগীয় কায়েদ জনাব মুহাম্মদ নূরুল্লাহ্ সাহেবের নাতী।

নবজাতকের দীর্ঘায়ূ ও জামাতের উত্তম খাদেম হওয়ার জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়া প্রার্থী হলেন জনাব সাইদুর রহমান আহমদীয়া মুসলিম জামাত, খুলনা।

● গত ১৭ ডিসেম্বর '৯৭ (৩ পৌষ, ১৪০৪, ১৬ শাবান ১৪১৮) বুধবার বিকাল ৪.৪০ মিনিটে আল্লাহ্তাআলা আমাদেরকে প্রথম কন্যা সন্তান দান করেছেন। প্রসূতি ও নবজাতিকার সুস্থতা, দীর্ঘায়ূ এবং খাদেমায়ে দীন হওয়ার জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাস দোয়ার আবেদন করছি। উল্লেখ্য, নবজাতিকার পক্ষে ওয়াকফে নও-এর জন্যে হুযূর (আইঃ)-এর নিকট আবেদন করা হয়েছে। জনাব এস, এম, রবিউল ইসলাম ও মিসেস শেলীনা ইসলাম, সুন্দরবন।

সুন্দরবন – ২১ ডিসেম্বর '৯৭ লাজনা ইমাইল্লাহ্র সুন্দরবনের ১৩তম বার্ষিক ইজতেমা সফলতার সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত ইজতেমায় ২৫৪জন লাজনা ও ১০৩ জন নাসেরাত যোগদান করেন।

শোক সংবাদ

কটিয়াদী (কিশোরগঞ্জ) – অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ২০ ডিসেম্বর '৯৭ কটিয়াদী জামাতের প্রবীণ আহমদী আফতাব উদ্দীন আহমদ সাহেব ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহে . . . . রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তার রূহের মাগফেরাতের জন্য সকলের নিকট দোয়ার আবেদন করেছেন এম. এ. হান্নান, প্রেসিডেন্ট, কটিয়াদী জামাত।

জুমুআর খুৎবা

শহীদ হওয়ার তাৎপর্য ও নামাযে ধৈর্যাবলম্বন

সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা, ১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে ফযল, লণ্ডন

তাশাহ্হুদ, তা'আওউয এবং সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা বাকারার ১৫৪ এবং ১৫৫ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ۝

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ بَلْ اَحْيَآءٌ وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ۝

(অর্থাৎ–হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সংগে রয়েছেন।)

(এবং যারা আল্লাহ্র পথে নিহত হয় তাদের সম্পর্কে বলো না যে, তারা মৃত বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না।)

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, এই আয়াতদ্বয় যা আমি তেলাওয়াত করেছি তার বিষয় থেকে দু'টি কথা পরিষ্কার। একটি হল, নামায এবং ধৈর্যের মাধ্যমে খোদাতাআলার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করার আদেশ।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ

হে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ যারা ঈমান এনেছ, আল্লাহ্তাআলার কাছ থেকে ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর।

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন

দ্বিতীয় আয়াতে এ বিষয় রয়েছে

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ؕ

এবং কখনও তাদেরকে মৃত বলোনা যারা আল্লাহ্তাআলার রাস্তায় নিহত হয়েছেন।

তাদেরকে মৃত বলো না, 'আমওয়াত' শব্দটি বহুবচন তাই এভাবে বলা উচিত যে, তাদেরকে মৃত আখ্যা দিও না। 'বাল আহ্ইয়াউন' কিন্তু তোমাদের এ বিষয়টির উপলব্ধি নেই যে, তাদের জীবনের মাহাত্ম্য কী! আজকের খুৎবার সঙ্গে এ দু'টি আয়াতের এভাবে সম্পর্ক রয়েছে যে, আমি নামায সম্পর্কে ধারাবাহিক খুৎবা দিচ্ছি, বিগত খুৎবাগুলোতেও যা কিছু বর্ণনা করেছি–এর মধ্যে ধৈর্যের যে উপদেশ আছে তা-ই আমি আজকের খুৎবায় আপনাদের সামনে বিশেষভাবে উপস্থাপন করতে চাই। দ্বিতীয়তঃ এজন্য যে, পাকিস্তান থেকে মোজাফ্ফর আহমদ শর্মা সাহেবের শাহাদতের সংবাদ এসেছে। তাঁর সম্পর্কে আমি আরও কিছু কথা বলব, কিন্তু একটি কথা নিশ্চিত যে, তাঁদের মৃত বলা যেতে পারে না। তাঁরা জীবিত তবে, তোমরা তা জান না। ধৈর্যের যে সম্পর্ক নামাযের সঙ্গে বাঁধা হয়েছে-এর দু'টি দিক রয়েছে যার দিকে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। একটি হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে ধৈর্যের সাথে। অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনা করে যেতে হবে। আল্লাহ্র সাহায্য কখন আসবে এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করার প্রয়োজন নেই। এ সাহায্য এমন নামাযের মাধ্যমে চাওয়া উচিত যার মধ্যে ধৈর্য থাকে। অর্থাৎ ধৈর্যের একটি অর্থ যা হযরত মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকা; যখন একবার একে লাভ করা যায় তখন সেটিকে ছেড়ে না দেয়া। ধৈর্যের বিষয়টি উভয় দিকে সমভাবে প্রযোজ্য হচ্ছে। একটি, ধৈর্যের কারণে। তুমি যে দোয়া খোদাতাআলার নিকট চাইবে তা নামাযের মাধ্যমে চাইবে আর নামাযেও ধৈর্য ধারণ করবে। কেননা, পরবর্তীতে এ ফল প্রকাশ করেন নি যে, (ইন্নাল্লাহা মা'আল মুসাল্লীন অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্তাআলা নামাযীদের সঙ্গে আছেন) বরং বলেছেন, 'ইন্নাল্লাহা মাআস সাবেরীন' (অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে রয়েছেন)। দু'ধরনের ধৈর্যের বর্ণনা এক সাথেই। 'ইসতা'ইনু বিস্সাবর' থেকে একথা পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে যে, কোন দুঃখ এবং বিপত্তির দিকে ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে। সাধারণ অবস্থায়ও নামাযে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। যখন কারো পক্ষ থেকে কোন কষ্ট আসে, জাতীয় কোন ক্ষতির ভয় হয় অথবা জাতীয় ক্ষতি হয়ে যায় তখন সে অবস্থায় বাধ্যতামূলকভাবে সাহায্য এবং ধৈর্যে এমন অটল সম্পর্ক সৃষ্টি হয় যে, এদেরকে পৃথক করা সম্ভব নয়। যদি বিপত্তিতে অধৈর্য প্রদর্শন কর তবে কোন লাভ হবে না। বরং যদি তখন ধৈর্য ধারণ করে দোয়া কর, যা বিশেষ করে নামাযে হওয়া উচিত যেভাবে আল্লাহ্তাআলার ওয়াদা রয়েছে যে, 'ইন্নাল্লাহা মা'আস সাবেরীন।'

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে 'লেমাইয়ুক্তালু ফিসাবিলিল্লাহে আমওয়াত'। যদিও প্রত্যেক শাহাদতের কারণে বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের দুঃখ হয়ে থাকে তথাপি আল্লাহ্তাআলার এ উপদেশকে কখনও ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, খোদাতাআলার রাস্তায় যাঁরা শহীদ হন তাদের মৃত্যু সাধারণ নয়। তাঁদের এবং সাধারণ মৃত্যুর মধ্যে এক পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্যকে আমরা সাধারণভাবে অনুভব করতে পারি না। অতীত যুগেও রসূলে করীম (সাঃ)-এর সময় এমন শহীদগণ ছিলেন আকাশে খোদাতা'আলার সমীপে উপস্থিত হয়ে যাঁদের পরস্পর বাক্যালাপ হয়েছে যা এলহামের মাধ্যমে আঁ হযরত (সাঃ)-কে জানানো হয়। অথচ প্রশ্ন-উত্তর অনেক দূরের একটি ঘটনা। নির্দিষ্ট ঐ কিয়ামতের পরে ঐ প্রশ্ন-উত্তর হবে তা আপনারা ধারণা করতে পারবেন না। সুতরাং রসূলে করীম (সাঃ)-কে

শহীদদের মৃত্যুর ঠিক পর পরই জানানো হয়। এথেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, যদি ঐ ঘটনাগুলি ঐ সময়েই হয়ে থাকে আর এটি সাধারণদের মত ভবিষ্যতের সংবাদ ছিল না এবং (এ শর্ত সাপেক্ষে) ঐগুলি ঐ সময়ই হয়েছিল তা হলে এগুলি সাধারণ মৃতদের থেকে একটি পৃথক বিষয়। শহীদদেরকে জান্নাতের জীবন তাঁদের নিহত হওয়ার সংগে সংগেই দিয়ে দেয়া হয়। হতে পারে এটাই সে বিষয় যা তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। "তারা জীবিত আর তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না"-এটির অন্য একটি দিকও রয়েছে যে, তাদের জন্য জাতি জীবিত থাকে। এই শাহাদতগুলিই জাতি জীবিত থাকার জামানত দেয়, অথচ তোমরা এ বিষয়টি ভুলে যাও, তোমাদের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুভূত হয় না যে, এঁরাই ঐসব ব্যক্তি যাদের কারণে আমরা জীবিত আছি। যদি শাহাদৎ না হয় তবে পেছনে রয়ে যাওয়াদের কোন জামানত নেই। যারা স্বাচ্ছন্দ্যে শাহাদতের জন্য খোদাতা'আলার সমীপে নিজেদের পেশ করে তাদের জীবিত করা হয় আর তাদের সাথে জাতিও জীবিত হয়। যতক্ষণ শাহাদৎ থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত জাতি জীবিত থাকবে অর্থাৎ খোদাতা'আলার জন্য জীবনদানকারী যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ এটা অসম্ভব যে, জাতি মরে যাবে। আপনারা এ উপলব্ধি সম্পর্কে পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত নন, কিন্তু আল্লাহ্‌তা'আলা এ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এভাবেই হয়ে থাকে।

তৃতীয় কথা তাদের জীবন সম্বন্ধে আমরা জ্ঞাত নই বা আমাদের উপলব্ধি নেই। তথাপি আমরা জানি, হয় প্রত্যেক মৃত্যুবরণকারী কার্যতঃ জীবিত হয়ে যায়। অর্থাৎ কিছু সময়ের জন্য সে আরও জীবন পায়। অতঃপর এমন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় যাকে 'আমলে বরযখ (অর্থাৎ মৃত্যু এবং হাশরের মধ্যবর্তী সময়) বলা হয়। অতঃপর দীর্ঘ সময়ের জন্য শুয়ে থাকার পর ঐ সময় উঠানো হবে যার দূরত্বের ধারণা আমাদের নেই। এ বিষয়টি শাহাদতের বিষয় থেকে পৃথক হওয়া উচিত। যদি পার্থক্য না-ই থেকে থাকে তবে এ আয়াত কেন বলছে তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ না। প্রকৃতপক্ষে এটা সে অবস্থা যার ধারণা আমরা করতে পারি না, কেবল এটা ব্যতিরেকে যে, জীবনের লক্ষণগুলি তাদের উপর প্রয়োগ করে দেখে নিই। একজন পরিপূর্ণ বুদ্ধি-জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি যখন জীবিত থাকে তখন তার উত্তরসূরীদের সঙ্গে একটি সম্পর্ক থেকে থাকে। এটাই কারণ যে, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে তারা পরবর্তীতে আগমনকারীদের জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ্‌র নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করেন। অতএব আল্লাহ্‌তাআলার সঙ্গে শহীদদের জীবনের সম্পর্ক এভাবে রয়েছে যে, তারা তাঁর নিকট বিনীতভাবে দোয়া করেন যেন তিনি আমাদের পরে আগমনকারীদের স্বীয় ফযলে ভূষিত করেন এবং খেয়াল রাখেন। অথচ সাধারণ মৃতদের পরবর্তীদের জন্য কোন খেয়াল থাকে না। সুতরাং তাদের (শহীদগণ) খেয়াল রাখা দ্বারা বুঝাচ্ছে যে, তাঁদের জীবন তাঁদের উত্তরসূরীদের বাহ্যিক এবং আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত করে দেয়। অর্থাৎ নতুন এ জীবন যা তাঁরা পেয়েছেন তাতে তাঁদের উত্তর সূরীদের সঙ্গে এমন গভীর সম্পক রয়েছে যা সাধারণ মৃতদের ব্যাপারে সম্ভব নয়। আরও অনেক কথা হতে পারে কিন্তু যেহেতু 'লা তাশউরূন' এ আল্লাহ্‌তাআ'লা বলেছেন,তোমরা উপলব্ধি করতে পারবে না। তথাপি যদি আমরা উপলব্ধি করে নিই তাহলে এ কথা ভুল প্রমাণিত হবে। এজন্য আমি নিজস্ব ব্যক্তিগত ধারণা বর্ণনা করেছি। আমি অনুমান করছি অর্থাৎ এটা এবং ওটা দুইই হতে পারে। এর অর্থ এই নয় যে, আমরা পরিপূর্ণভাবে জ্ঞাত তবে এটুকু বিশ্বাস রাখা দরকার যে, তাঁরা জীবিত মৃত নন।

এরপর আমি শহীদ মোজাফফর আহমদের শাহাদতের ঘটনা বর্ণনা করছি। যেভাবে আমি বর্ণনা করে এসেছি যে, বিচ্ছেদের দুঃখ হয়ে থাকে তবে এ আয়াতগুলিতে এমন সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যার কারণে এ ব্যথা-বিচ্ছেদের দুঃখ ও বিলাপে রূপান্তরিত হওয়া উচিত নয় বরং আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে ওয়াদা রয়েছে যে, তাঁরা অন্য প্রকারের ব্যক্তি। তাঁরাই জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। এজন্য আল্লাহ্‌তাআলার নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত যে, তিনি আমাদের জামাতেও পূর্ববর্তীদের মত শাহাদতের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন। ঐ শাহাদতগুলি যা পুণ্য কাজে ব্যস্ত থাকার জন্য শত্রুদের চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও পেশ করা হয়, তা অত্যন্ত সম্মানের। এর অর্থ হচ্ছে এই যে, শাহাদতের ভয়ে কাজ বন্ধ করো না। শত্রুরা যা করতে চায় করুক। কিন্তু আমরা নিহত না হয়ে যাই এই ভয়ে কাজ বন্ধ করো না। এতদ্‌সত্ত্বেও তবলীগের জন্য আল্লাহ্‌তাআলা উপদেশ দিয়েছেন যে, যেটুকু সম্ভব হিকমতের সঙ্গে কাজ কর। একই সঙ্গে ও দু'টি জিনিষ যার পরিমাপের নাম সফল তবলীগ। যদিও শাহাদত সম্পর্কে আমাদেরকে এ সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে যে, এটি অনেক বড় বিষয় তথাপি গাজীদের সম্পর্কে আল্লাহ্‌তাআলা কুরআন শরীফে অনেক কিছু বলেছেন। সুতরাং যখনই আমার কাছে শাহাদতের জন্য দোয়ার পত্র আসে, আমার জানা নেই যে, শহীদ মোজাফ্‌ফর আহমদের পুরোনো পত্রগুলো সংরক্ষিত আছে কিনা; কিন্তু আমার যতটুকু স্মরণ আছে ঐ পত্রগুলিতে শাহাদতের এমন বর্ণনা ছিল যেন (শাহাদত) হঠাৎ ঘটে যাওয়া ধারাবাহিক কোন সাধারণ ঘটনা। শাহাদতের ব্যাপারে শহীদ মোজাফ্‌ফর আহমদের বিন্দু মাত্র সন্দেহ ছিল না যে, তিনি এখানে শহীদ হতে পারেন। এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর পদস্খলন হয়নি। এমন কোন ভয় তাঁর হৃদয়ে ছিল না। তিনি দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন যে, বাধ্যতামূলকভাবে তিনি তার কাজকে অব্যাহত রাখবেন এবং দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই যে, তাঁকে এ কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে।

প্রথমে আমি তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি-তিনি কে, কার ছেলে কার নাতী ছিলেন? শহীদ মোজাফ্‌ফর শর্মা শিকারপুর জেলাসমূহের ভারপ্রাপ্ত আমীর ছিলেন। তিনি চারটি জেলাঃ শিকারপুর, জেকোবাবাদ, সখ্‌খর ও সুটকী-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ছিলেন। তিনি শিকারপুর জেলাসমূহের আমীর জামাত মোহ্‌তরম আব্দুর রশিদ শর্মা সাহেবের ছেলে ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে তিনিই এই চার জেলার ভারপ্রাপ্ত আমীর ছিলেন। তাঁর দাদা মুন্সী আব্দুর রহীম শর্মা সাহেব হিন্দু থেকে মুসলমান হয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত মুখলেস ব্যক্তি ছিলেন। এটা তাঁরই আন্তরিকতা যা তাঁর নাতীর শাহাদতের মাধ্যমে আজ প্রস্ফুটিত হচ্ছে। এ ঘটনায় মোহ্‌তরম গাযালা বেগম সাহেবা, যিনি মোহ্‌তরম মরহুম মোবারক আহ্‌মদ সাহেবের স্ত্রী এবং তাঁর মেয়েদেরকে (শহীদ মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেবের ভাতিজীগণ) গাড়িতে উঠিয়ে দেয়ার জন্য রেল স্টেশন নিয়ে যাচ্ছিলেন। এখানে 'মরহুম' শব্দটি লিখা ঠিক নয়। কেননা, তাঁর বড় ভাই মোবারকও শহীদ ছিলেন, যে স্থানে তাঁকে (মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদকে) গুলি করে শহীদ করা হয়েছে ঠিক একই

স্থানে তিনিও (মোবারক শর্মা) শাহাদতের সম্মান পেয়েছেন। মোবারক আহ্‌মদকে আমি এজন্য শহীদ বলছি যে, কুড়াল দিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে এবং মাথায় গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করা হয়েছিল, যদিও তিনি ঐ আঘাতের পর দুই বৎসর যাবৎ জীবিত ছিলেন তথাপি এগুলিই সেই আঘাত ছিল যার কারণে শেষে তাঁর মৃত্যু হয়। সুতরাং আঘাতের যে ধারা ধর্মের শত্রুতার কারণে হয়ে থাকে এবং ঐ আঘাতে অসুস্থতার কিছুকাল পর তিনি মৃত্যু বরণ করেন তাঁকে মরহুমের পরিবর্তে শহীদ লিখা উচিত। তাঁর বড় ভাই শহীদ হওয়ার ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে ভাবে তাঁর অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল সেগুলি অবশ্যই ঐ আঘাতের ছিল যার কষ্ট আরও কিছুকাল সহ্য করা তাঁর ভাগ্যে লিখা ছিল। সুতরাং ইহা শাহাদতই ছিল এবং শাহাদাতের সংগে শারীরিক যে কষ্ট হয়ে থাকে তা দীর্ঘ হয়ে গিয়েছিল। মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব তাঁর বিধবা (শহীদ মোবারক আহ্‌মদ সাহেবের স্ত্রী), মোহ্‌তারমা গাযালা বেগম সাহেবাকে গাড়িতে উঠিয়ে দেয়ার জন্য নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি টমটমে বসা ছিলেন এবং শহীদ মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ সাহেব মটর সাইকেলে পেছন পেছন আসছিলেন। সিভিল হাসপাতালের কাছে পেট্রোল পাম্পের সামনে পেছন থেকে একটি মোটর সাইকেল আসে। টমটমে বসা তাঁর এক ভাতিজী তাকে (পেছনের মোটর সাইকেল আরোহীকে) পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে, এর পরপরই গুলির শব্দ হয় এবং তৎক্ষণাৎ শহীদ মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর ভাবী তাঁকে উঠান। তখনও তিনি জীবিত ছিলেন। যেভাবে আমি বলেছি, এটা শাহাদতই ছিল। মৃত্যু হোক তা কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে অথবা দু'বছর ভুগে ভুগে এগুলি শাহাদতই। তারপর তাঁকে হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালে ক্ষতের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে তিনি স্রষ্টার সমীপে স্বীয় জীবন সমর্পণ করেন। শহীদ মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ শর্মা যখন শহীদ হন তখন তাঁর বয়স ছিল ৪২ বৎসর। তিনি অত্যন্ত একনিষ্ঠ এবং নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন আইনজীবী কিন্তু কার্যতঃ কখনও তিনি আইন ব্যবসা করেন নি। তা সত্ত্বেও তাঁর খুব প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সারা শহরে তাঁর পুণ্যের এত বেশি চর্চা ছিল যে, শহরের বড় বড় বুদ্ধিজীবীও তাঁর সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব রাখতেন। যদিও সেখানে আহ্‌মদীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটানো হয় তা সত্ত্বেও তারা তাঁকে শিকারপুর জেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সু-সম্পর্কেরই ফসল যে, অন্যরা সম্মিলিতভাবে তাঁকে নিজেদের প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করেছিলেন। তাঁর প্রভাব এমনই ছিল যে, এক অনুষ্ঠানে তাঁর দাওয়াতে চার জেলার জেলা প্রশাসকগণ সামিল হন।

শিকারপুরে একটিমাত্র আহ্‌মদী পরিবার ছিল যারা ১৯৯৫ সনেও অনেক বড় আর্থিক কুরবানী করেছে এবং এ পরিবারটি প্রত্যেক বিপদ অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সহ্য করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর পিতাকে অনেক দীর্ঘ সময় থেকে জানি। তাঁদের কারখানা ছিল, যার উপর নির্মমভাবে আক্রমণ করে সব কিছু নষ্ট কর দেয়া হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁদের (ঈমানের) দৃঢ়তার উপর কোন আঁচড় আসে নি। আমি তাঁদেরকে সান্ত্বনার পত্র লিখি তারাও আমাকে সান্ত্বনার পত্র লিখেন।

সরকারের পক্ষ থেকে একটি অত্যন্ত হীন বিষয় যা প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে, তাঁদের নিকট ধমকের যে পত্র আসত আর তা পত্রিকায় ছাপা হত যাতে মৌলভীদের নামও লিখা থাকত তা সত্ত্বেও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেয় নি। এটা সেই দল ইদানীং যার নেতা ফজলুর রহমান। যে পত্রগুলো তাঁদের নামে আসত এবং পত্রিকায় ছাপা হত আপনারা যদি সেই পত্রের শব্দগুলি পড়েন তাহলে দেখতে পাবেন যে, এত নোংরা যে, কাউকে পড়ে শোনানও সম্ভব নয়। "সিপাহি সাহাবা"-এর নেতা-সেক্রেটারী মাওলানা আলী শের হায়দরী, অত্যন্ত নাপাক জঘন্য বাজে প্রলাপ তাঁর এবং তাঁর পত্নী সম্পর্কে পত্রিকায় ছাপায়। পৃথিবীতে এমন কোন সভ্য সরকার নেই যে, এত নোংরা পত্র ছাপানোর পর নোটিশ না করে থাকতে পারে। অত্যন্ত ঔদ্ধত্যের সাথে পত্রিকায় নাম লিখে হত্যার হুমকি দেয়া যে, "আমরা তোমাদেরকে অবশ্য হত্যা করব।" অথচ ঐ অসভ্যদের মুখ ভাঙ্গা হয় নি। দুনিয়াতে কোন দেশে যদি পত্রিকাসমূহে প্রকাশ্যে কারও নাম নিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয় তবে এটা অসম্ভব যে, সরকারের আমলারা ত্বরিৎ গতিতে পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, কিন্তু পাকিস্তানে এমনই হচ্ছে যে, তাদের থেকে আমাদের কোন প্রত্যাশা নেই এবং ভরসাও নেই। আমাদের ভরসা কেবল এর উপর যে,

আমরা আমাদের আকুতি কেবল আমাদের প্রতিপালকের কাছে পেশ করব এবং সব সময় পেশ করতে থাকব। ধৈর্য আমাদের যেমন শিখিয়েছে যে, বাহ্যতঃ তোমাদের দোয়ার ফল দৃষ্টিগোচর হোক বা না হোক তোমাকে তা প্রতিনিয়ত অব্যাহত রাখতে হবে। এই দোয়ার ফল আল্লাহ্‌তাআলার উপর ছেড়ে দাও। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে যেখানে আপনারা তাঁর উত্তরসূরীদের জন্য দোয়া করবেন এবং দোয়া করা অব্যাহত রাখবেন যেখানে আল্লাহ্‌তাআলার সমীপে এই আকুতিও জানান যে, এ অত্যাচারীদের ভয়ংকর অত্যাচার যারা সংখ্যায় অনেক, তাদেরকে তাদের অপকর্মের পরিণামে পৌঁছে দিন। তাদের এত নোংরা ও অশ্লীল ভাষার পর আমি এক মুহূর্তের জন্যে ভাবতে পারি না যে, তাদের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসতে পারে। মৌলভী সেজে বসে আছে কিন্তু এমন অপবিত্র কথা যা থেকে তাদের হৃদয়ের বিদ্বেষই উন্মোচিত হয়। আল্লাহ্‌তাআলা খাবারের এবং বর্জ্য নিষ্কাশনের পৃথক রাস্তা নির্ধারণ করেছেন। আজকাল পাকিস্তানের মৌলভীদের অবস্থা তো এই যে, তাদের রাস্তা একটিই। যে মুখে তারা খোদাতাআলার কথা বলে ও কলেমা পড়ে, সে মুখেই এত নোংরা বাক্য উচ্চারণ করে যে, সেগুলিকে দৈহিক বর্জ্যের সাথে তুলনা দিলেও সেই বর্জ্যের ব্যাখ্যা পূর্ণ হয় না। যে অশ্লীল বাক্য তাদের মুখ থেকে বের হয় তার তুলনায় শারীরিক বর্জ্য কিছুই নয়। এজন্য তাঁদের একটি রাস্তাই রয়ে গেছে যে রাস্তা দিয়ে তারা দরূদ পড়ে সেই রাস্তা দিয়েই অত্যন্ত জঘন্য অশ্লীল কথা বলে। এজন্য তাদের দরূদ কবুল হতেই পারে না। কেননা, তাদের রাস্তা নোংরা হয়ে গেছে। আমি যেভাবে এখানে বর্ণনা করেছি, তা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, এগুলো অত্যন্ত কুৎসিত। যাই হোক, আমি বিস্তারিত ব্যাখ্যায় যেতে চাই না। আমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। এই ধৈর্যের সঙ্গে আমি সমস্ত জামাতের পক্ষ থেকে তার (শহীদ মোজাফ্‌ফর আহমদ) উত্তরসূরীদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। আমি বিশ্বাস করি যে, তারা পরিপূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে ধৈর্যের উপর অবিচল থাকবে।

শহীদ মোজাফ্‌ফর আহমদের নামাযে জানাযা গায়েব জুমুআ ও

আসরের নামাযের পর এখানে অনুষ্ঠিত হবে।

এখন আমি নামাযের বিষয়-বস্তুর দিকে যাবার পূর্বে হযরত সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সাহেবের মৃত্যুতে পৃথিবীর বিভিন জায়গা থেকে লাগাতার যে পত্র আসছে এ ব্যাপারে বলতে চাই যে, আমার এবং আমার স্টাফের পক্ষে এর জবাব দেয়া অসম্ভব। তবে নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, সমস্ত পত্রের উপর আমি নিজে দৃষ্টি দিই এবং দেখি কে লিখেছে, কী লিখেছে। এজন্য তাদের হৃদয়ে যে আকাঙ্খা তা আমার দৃষ্টি দেওয়ার প্রেক্ষিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। ঐ সময় তাদের জন্য হৃদয় থেকে যে দোয়া বের হয় তা ঐ আকাঙ্খারই একটি অংশ। সুতরাং যদি আমার পক্ষ থেকে প্রাপ্তির সংবাদ না পৌঁছায় তবে বিষণ্ন বা সন্দিহান হবেন না যে, পত্র আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে কি না। আমি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি চিঠি দেখে না নিই, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার রাতের কার্যক্রম শেষ হয় না। ফাইল যতক্ষণ পর্যন্ত আমি দেখে না নিই ততক্ষণ পর্যন্ত অফিস বন্ধ করি না। এই ব্যাপারে আপনারা নিশ্চিত থাকুন। সাহেবযাদা মির্যা মনসূর আহমদ সম্পর্কে আমি আরও অনুসন্ধান করেছি। একটি বিষয়ে আমি আশ্চর্যান্বিত যে, আল্লাহ্‌তাআলা একটি ব্যতিক্রমধর্মী বয়স দেয়ার সংবাদ দিয়েছিলেন। তা হযরত মসীহ মাউউদ (আঃ)-এর সমস্ত পুরুষ-সন্তানদের মধ্যে তার সমপরিমাণ বয়স আর কেউ পান নি। "খেলাফে তাওয়াক্কু" (আশাতীত) শব্দটি আশ্চার্যান্বিতভাবে পূর্ণতা পাচ্ছে। এই "খেলাফে তাওয়াক্কু" শব্দটি আমাকে অনুসন্ধান করতে বাধ্য করে। আমি প্রথমে মনে করেছিলাম ভাইজান হযরত মির্যা আযীয আহমদ সাহেবের বয়স সবচেয়ে বেশী ছিল। আরও কতকের দিকে আমার দৃষ্টি গিয়েছিল। হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের সম্পর্কে মনে হয়েছিল যে, তার বয়স হয়তো বেশী ছিল। এ প্রেক্ষিতে জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ দেখা হয়েছে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর পুরুষ-সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে কেউই তার মত দীর্ঘ জীবন পান নি। সুতরাং এলহাম সম্পর্কে আমরা যেমন বলি যে, এগুলো নিজেরাই কথা বলে থাকে। "আমরা পূর্ণ হচ্ছি" এই এলহামটিও অবশ্যই তাঁর (মির্যা মনসূর আহমদ) সম্পর্কে এভাবে বলছে। কেননা, "খেলাফে তাওয়াক্কু" সম্পর্কে কথা হচ্ছিল। "খেলাফে তাওয়াক্কু" শব্দটি কি কেবল এক ব্যক্তি সম্পর্কে পূর্ণ হবার ছিল? আল্লাহ্‌তাআলা তার চারিদিকে জান্নাত দান করুন। তার সম্পর্কে এলহামসমূহের যে ধারাবাহিকতা ছিল তা অনেক পরিপক্ক এবং নিশ্চিত ছিল যে, তাতে কারও নিজস্ব ধারণার কোন অবকাশ নেই। এগুলো অবশ্যই পূর্ণ হয়েছে/এখন নামায সম্পর্কে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্ধৃতিসমূহ আমি পুনরায় শুরু করছি। কেননা, রমযান প্রায় সমাগত। আমাদের নামাযসমূহকে সাজানো প্রয়োজন। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজন আরও বেশী। **পৃথিবীর বিশৃঙ্খলা থেকে আমাদের বাঁচবার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে নামায। যা দৃষ্টিতে আসে এছাড়া আমাদের মত দুর্বলদের জন্য আর কোন উপায় নেই। নামাযকে সজ্জিত করুন, এর মাধ্যমে আমাদের জীবন গড়বে।** গল্পে কারো সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেন তাদের জীবন তোতা পাখিতে আবদ্ধ খাঁচায় বন্দী। যদি প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হতো, যা আদৌ বাস্তবে সম্ভব নয়। তবে নিশ্চয় এ গল্পগুলি কোন্ সংবাদ বহন করে। আমার দৃষ্টিতে গল্পগুলো এ সংবাদই দিচ্ছে যে, **মু'মিনদের জীবন একটি বিশেষ জিনিষের সঙ্গে আবদ্ধ। যদি তারা সেটিকে জীবিত রাখে, তবে তারা জীবিত থাকবে। অতএব দুনিয়ার গল্পে সেটি তোতা যার মধ্যে কারও জীবন যদি বন্দি থাকে থাকুক। আমাদের তোতা আমাদের নামায। যখন নামায মরে যায় তখন সবকিছুই মরে যায়। যখন নামায জীবিত থাকে তখন প্রত্যেক মু'মিনও জীবিত থাকে। নামাযই জীবন।**

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "আল্লাহ্‌তাআলা আত্মা এবং শরীরকে পরস্পরের সাথে যুক্ত রেখেছেন। শরীরের প্রভাব আত্মার উপর প্রতিফলিত হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি কোন ব্যক্তি লৌকিকভাবে কাঁদে তবে অবশেষে কান্না এসেই যায়।" এমনিভাবে যে লৌকিকভাবে হাসে অবশেষে হাসি এসেই যায়। এটি এমন সত্য যে, পৃথিবীতে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যদি আপনি জোরপূর্বক কান্নার অবস্থা সৃষ্টি করেন, তবে কান্না এসেই যাবে। আবার যদি জোরপূর্বক হাসির অবস্থা সৃষ্টি করেন তবে হাসি এসেই যায়। হযরত মসীহ (আঃ) ঐ ব্যক্তিদের সম্বোধন করেছেন, যারা বলে, নামাযে আমাদের কান্না আসে না। তিনি (আঃ) বলেন "লৌকিকতা অবলম্বন করার চেষ্টা কর এ ধরনের লৌকিকতা সিদ্ধ", এটি কৃত্রিম নয়, বরং খোদাতাআলাকে স্মরণ করার জন্য আত্মার যে অবস্থা সে অবস্থা ঐ কান্নার মধ্যে লুক্কায়িত, যা খোদার স্মরণে আসা উচিত। যদি তা না থেকে থাকে তবে এখানে সে লৌকিকতা অবৈধ নয়। যেহেতু ঐ লৌকিকতার সম্পর্ক নিজের সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্মুখে প্রদর্শনের জন্য নয়, এজন্য এটিকে কখনও কপটতা বলা যাবে না।

তিনি (আঃ) বলেছেন, "এমনিভাবে নামাযের যত অবস্থা শরীরের উপর পতিত হয় উদাহরণস্বরূপ দাঁড়ানো তৎসঙ্গে রুকূ করা (এগুলি) আত্মার উপর প্রভাব ফেলে।" এ বিষয়ে বর্ণনা করার পর হুযূর (আঃ) বলেন, "যখন মানুষ বিনয়ের শেষ অবস্থানে পৌঁছে তখন সে কেবল সেজদাই করতে চায়। পশুদের মধ্যেও এ অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। কুকুরও যখন তার প্রভুর সঙ্গে ভালোবাসা প্রকাশ করে তখন তার পায়ে মাথা কুটে।" দেখুন ঐ উপমাটি কত সত্য উপমা। কুকুর যখন তার প্রভুর সঙ্গে ভালবাসা প্রকাশ করে তখন তার মাথা প্রভুর পায়ে রেখে দেয়। আমি তো বাল্যকালে শিকারের এবং ঘরের হেফাযতের জন্য কুকুর পুষেছিলাম। তাদের এই জন্য বিদায় করে দিতে হয় যে, এরা নিজেদের ভালবাসার প্রকাশার্থে আমার পদলেহন করত, কুকুরের পদ লেহনের কারণে আমার যন্ত্রণা হতো – মুমিনদের মধ্যে যে ঘৃণা জন্মে শেষ পর্যন্ত আমাকে এদের বিদায় করে দিতে হয়। এ কথার সঙ্গে সে কথা মনে পড়ে গেল। বাল্যকালে আমিও নিজে দেখেছি যখন মালিক তার ঘরে প্রবেশ করে কুকুরকে ভালবেসে, তাকে খাবার খাওয়ায় এবং আরামের ব্যবস্থা করে তখন সে দৌড়ে এসে মালিকের পদলেহন করে এক ধরনের সিজদা করে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলছেন, "কুকুর যখন তার প্রভুর সঙ্গে ভালবাসা প্রকাশ করে তখন তার পায়ে মাথা কুটে। নিজের ভালবাসার সম্পর্ক প্রকাশ করে সিজদার মাধ্যমে। এতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে, দেহ ও আত্মার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক আছে। এমনিভাবে আত্মার অবস্থার প্রভাব দেহের উপর প্রকাশিত হয়। যখন আত্মা ব্যথিত হয় তখন দেহের উপর তা পরিলক্ষিত হয়।" এই সত্যের মধ্যে কোন সন্দেহ নেই যে, আত্মা ব্যথিত হলে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। আজকাল

জামাতে হোমিওপ্যাথির চেষ্টা চলছে, সমস্ত হোমিওপ্যাথরা জানেন যদি তৎক্ষণাৎ কোন দুঃখের অবসান ঘটানো না হয় তবে সারা জীবনব্যাপী গভীর রোগের সৃষ্টি হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হোমিওপ্যাথি চর্চার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা সত্ত্বেও তিনি এই মূল-তত্ত্বকে জানতেন। এটি একটি তত্ত্ব। কোন দুঃখের কারণে আত্মা ব্যথিত হওয়ায় এর প্রভাবে বাধ্যতামূলকভাবে শারীরিক রোগের সৃষ্টি হয়। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এ প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন, "নামাযে কখনও স্বাদ আসে আবার কখনও তা হ্রাস পায়। এর চিকিৎসা কী?" এ ব্যাপারে হুযুর (আঃ) বলছেন, আমি একটা কথা বলে দিচ্ছি যা সতর্কবাণী যেভাবে সবাই নামাযের খুৎবাসমূহের কারণে প্রত্যেক দিকে নিজেদের নামাযের উপর দৃষ্টি দেয়া শুরু করেছে। আমি তাদের কতকের ব্যাপারে সন্দিহান যে, তারা যেন প্রয়োজনের তুলনায় বেশী কিছু না করে বসে। এতে মস্তিষ্কের উপর প্রভাব পড়তে পারে। এমন অনেক দুর্বল মানুষ রয়েছেন যারা তাড়াতাড়ি আধ্যাত্মিকতার ধাপে উন্নীত হতে চায়। কিছুকাল পরে তাদের মস্তিষ্কে এমন দাগ কাটে যে, তারা কল্পনার ধ্যানে ঘুরপ্যাঁচ খান। তারা তখন ধর্মীয় উন্মাদ হয়ে যায়। এই জন্যে আঁ হযরত (সাঃ)-এর এই উপদেশ কখনও ভুলবেন না যে, **পুণ্যের দিকে যাত্রায় ধীর গতি অবলম্বন করুন। আরামের সঙ্গে ভ্রমণ (আধ্যাত্মিক) করুন। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিন। যখন আবহাওয়া সুন্দর হয় এবং আল্লাহ্‌তাআলার পক্ষ থেকে এমন হাওয়া বয় যে, তাঁর ইবাদতের দিকে এমনিতে দৃষ্টি যায়। তখন দ্রুত অগ্রসর হোন। এটি হলো সেই পদ্ধতি যা অবলম্বন করে ইনশাল্লাহ্‌ কেউ কোন সময় ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।** এ বিষয় থেকেই আমার দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয় যে, এমনিতে (নামাযে) স্বাদ আসে আবার স্বাদ চলেও যায়। এটি কপটতার নিদর্শন নয়। মানুষের স্বভাব একটি চাপ সৃষ্টি করে; অতঃপর ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নেয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের দেহ সব সময় নামাযে স্বাদ পায় না তাদের ক্লান্ত হওয়া নিশ্চিত বিষয়। এটি কোন মন্দের চিহ্ন নয়। এ অভিজ্ঞতা প্রাথমিক অবস্থায় সফরকারী সাধকের হয়ে থাকে। সে স্থায়ীভাবে নিজের নামাযের অবস্থা একই রকম রাখতে পারে না। হুযুর (আঃ) বলছেন, "সাহস হারান উচিত নয়।" বরং উহা হারানোর অনুভব থাকা এবং পুনরায় সেই স্বাদকে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। তিনি (আঃ) বলেন, "আপনার হাত থেকে কোন জিনিষ হারিয়ে গিয়েছে যদি আপনি অনুভব করেন যে, তা হারিয়ে গিয়েছে তবে এই অনুভব অত্যন্ত জরুরী; কিন্তু চিন্তায় নিমজ্জিত হওয়ার প্রয়োজন নাই যে, কিছু হারিয়েছে।" এর অর্থ হচ্ছে এই যে, এমনি চিন্তা প্রয়োজন যে চিন্তায় হারিয়ে যাওয়া (স্বাদ) ফিরে পাবেন। তিনি (আঃ) বলছেন, "চেষ্টা করা উচিত যেভাবে চোর চুরি করে নিয়ে যায় এতে "মালিকের আফসোস হয়", যদি নামাযে স্বাদ হারিয়ে যায় তবে অবশ্যই সেভাবে আফসোস করা উচিত যেভাবে সম্পদ হারিয়ে যাবার সময় হয়। অতঃপর মানুষ চেষ্টা করে যেন ভবিষ্যতে এ বিপদ থেকে নিরাপদ থাকতে পারে। যখন জাগতিক সম্পদ চোর চুরি করে নিয়ে যায়, তখন এজন্য অনেক সময় (মালিক) এলার্ম (Alarm) লাগায়। দরজা, জানালা মজবুত করে। হুযুর (আঃ) বলছেন যে, এর এই ফল প্রকাশ পাওয়া উচিত যে, তুমি নিজের নামাযের আরও হেফাযতের ব্যবস্থা নাও। তিনি (আঃ) বলেন, "এজন্য সাধারণ অবস্থা থেকে বেশী সতর্কতা ও প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ কর। এইরূপে যে, "খবীস (ভ্রষ্ট) নামাযের স্বাদ এবং ভালবাসাকে নিয়ে গিয়েছে তার থেকে সতক থাকা উচিত।" এখানে "খবীস" বলতে শয়তান বুঝাচ্ছে। জাগতিক ডাকাতেরাও খারাপ মানুষ হয়ে থাকে। এখানে শয়তানকে "খবীস" বলা হয়েছে এবং তিনি (আঃ) বলেন যে, "খবীস নামাযের স্বাদ এবং ভালবাসাকে নিয়ে গিয়েছে।" যেন সে ডাকাতি করেছে এবং তোমাদের নামাযকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। তার থেকে অতীব সতর্ক থাকার প্রয়োজন। কেননা, ইহা খুবই পরিতাপের বিষয়। যেভাবে আপনি জাগতিক ক্ষতির কারণে পরিতাপ করেন, সেভাবে যদি আধ্যাত্মিক ক্ষতির জন্যও পরিতাপ করেন তবে আল্লাহ্‌তাআলা সেই তৌফীক দিয়ে দিবেন যার কারণে আপনি আপনার নামাযের হেফাযত করতে পারেন। তিনি (আঃ) বলছেন, "সে যেন ভাবনাহীন এবং বেদনাহীন না হন, নামায স্বাদহীন হওয়া এক চোরের চুরি এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধি। এক চোর আপনার জিনিষপত্র চুরি করেছে। যেমনভাবে একজন রুগীর মুখের স্বাদ পাল্টিয়ে গেলে সে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসার জন্য চিন্তা করে। ঠিক সেইভাবে যার আধ্যাত্মিক স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় তার সত্বর সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।"

এখানে পৌঁছে (তিনি [আঃ]) প্রথমে উদাহরণকে ছেড়ে দিয়েছেন। সাধারণভাবে এমন কথা বলেছেন, যা সবাই পরিষ্কার বুঝতে পারে। ঐ খবীসের চুরির যে বর্ণনা এসেছে তা এমন একটি অভিপ্রায় যা আপনার চিন্তায় না-ও আসতে পারে। কিন্তু এ কথাটি আপনি জানেন। তিনি (আঃ) বলছেন, "অনেক সময় ভাল খাবার পাওয়া যায়, কিন্তু সেই খাবারের স্বাদ হারিয়ে যেতে থাকে। স্বাদ হারিয়ে যাওয়া রোগের কারণে হয়ে থাকে।" ভাল ভাল খাবারও যদি আপনার সম্মুখে রাখা হয় আর যদি আপনি অসুস্থ হন, (আপনার মুখে) স্বাদ না থাকে তবে খাবারে কোন তৃপ্তি আসবে না। এটি খাবারের কোন ত্রুটি নয় বরং যে খাবার খাচ্ছে তার ত্রুটি। তার জিহ্বার ত্রুটি যে, সে আহার করছে কিন্তু কোন স্বাদ পাচ্ছে না। সুতরাং মসীহ্‌ মাওউদ (আঃ) এ দৃষ্টিকোণ থেকে নামাযের বিশ্লেষণ করেছেন। এটিকে সম্মুখে রাখবেন।

এরপর তিনি (আঃ) (প্রকৃত নামায) সম্পর্কে বলছেন–"স্মরণ রাখবে! এই নামায এমন জিনিষ যা দিয়ে দুনিয়া এবং ধর্ম উভয়কে সাজান যায়।" বর্তমানে অনেকে এমন আছেন যাদের নিকট দুনিয়া যত প্রিয় কিন্তু নামায তত প্রিয় নয়। এ কথাটি ভাল করে বুঝে নিন যে, **নামায কেবল ধর্মের জন্য নয় বরং দুনিয়ার জন্যও প্রয়োজন।** কেননা, জাগতিক প্রয়োজনাদি এমনিতে লেগেই আছে। দেখুন! এজন্য সে অর্থাৎ জাগতিক ব্যক্তি কত রকমের প্রচেষ্টা এবং অভিসন্ধিইনা করে।

তিনি (আঃ) বলেন, "নামায এমন বিষয় যা আদায় করার প্রেক্ষিতে প্রত্যেক প্রকারের নির্লজ্জতা এবং অপকর্ম থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। যেভাবে আমি পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি যে, এ ধরনের নামায পড়া মানুষের নিজ ক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত নয়। এ পদ্ধতি খোদাতাআলার সহযোগিতা ছাড়া (আদায়) সম্ভব নয়।" এটি ঐ আয়াতের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়-বস্তু যার তেলাওয়াত আমি করেছি। তিনি (আঃ) বলেছেন, "খোদাতাআলার সাহায্য এবং সহযোগিতা ছাড়া (প্রকৃত নামায) লাভ করা সম্ভব নয়।"সুতরাং নামাযের মধ্যে ধৈর্যের যে শিক্ষা রয়েছে তার আশ্রয়স্থল নামাযই অর্থাৎ সাহায্য প্রার্থনা করা। তবে প্রথম সাহায্য প্রার্থনা যেন এটি হয় যে, আল্লাহ্‌তাআলা তোমাদের নামায পড়ার

সৌভাগ্য দান করেন। আপনি যদি এভাবে দোয়া করেন তবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দোয়াতে লেগে না থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এমন বিনয় এবং কান্নাকাটির সৃষ্টি হতে পারে না"। এজন্য তোমাদের দিবা-রাত্রি, বস্তুতঃ কোন মুহূর্ত যেন দোয়াশূন্য না হয়। যাদের জন্য দীর্ঘ সময় নামাযে রত থাকা সম্ভব নয় অর্থাৎ এখনও তাদের এ রীতিনীতির শিক্ষা হয়নি, এটি বোঝা মনে হয়, তাদের জন্য এটি (প্রতিনিয়ত দোয়া) একটি চিকিৎসা। সাধারণভাবে যখন তারা কোন নির্দিষ্ট রীতিনীতির অনুশীলনের মধ্যে থাকে না এবং তখন তারা চিন্তায় চলাফেরায় এবং অন্যান্য প্রত্যেক বিষয়ে স্বাধীন থাকেন। তিনি (আঃ) বলেন, "সেই সময়ও দোয়াতে রত থাক যখনই স্মরণ হয়, তখনই দোয়া কর, হে আল্লাহ্! যেভাবে আমাদের এই বাহ্যিক স্বাধীনতায় আনন্দ আসছে সেইভাবে তোমার জন্য যে বন্দীজীবন সহ্য করছি তাতেও যেন আনন্দ আসে। এ স্বাধীনতা যেন বন্দীজীবন মনে হয়। আর সে বন্দী জীবন যা নিয়ে আমরা তোমার সমীপে উপস্থিত হব তা যেন স্বাধীন মনে হয়"। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যেভাবে বলেছেন যদি আপনি সেভাবে দোয়া করেন তাহলে আপনি এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারবেন।

"আদ্‌দুন্‌ইয়া সিজ্‌নু লিল্ মু'মিনু ওয়াল জান্নাতু লিল্ কাফিরু"

(অর্থাৎ দুনিয়া মু'মিনের জন্য কারাগার আর কাফেরদের জন্য জান্নাতস্বরূপ)

মু'মিন ইচ্ছাকৃতভাবে সেই কারাগারের দিকে দৌড়ে যায়, যাকে কাফের জান্নাত মনে করে। যাকে সে (কাফের) জান্নাত মনে করে সেখান থেকে সে (মু'মিন) ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে নিজের কারাগারের দিকে চলে যায়। কারণ ইহাই তার জান্নাত। সুতরাং দৃশ্যতঃ এটি একটি স্ববিরোধী কথা মনে হয়। কিন্তু আমি যে হাদীসটি বর্ণনা করেছি তাতে প্রকৃতপক্ষে এরূপ বিষয়ই রয়েছে। এটি বলা হয়নি যে, তুমি (মু'মিন)ও চলে যাও। "আদ্‌দুন্‌ইয়া সিজ্‌নু লিল্ মু'মিন" এর মধ্যে এ উপদেশ রয়েছে যে, ইহা কারাগার বটে কিন্তু মু'মিনের জন্য সেটি তা, যা সে নিজে নিজেই চায়, তার উপর কোন জবরদস্তি নেই। সে কারাগার থেকে মুক্ত হয় না বরং দৌড়ে সেখানে চলে যায়। বর্তমান দিনগুলি যা রমযানের নিকটতর। এর উপর এই হাদীসটি আরও বেশী প্রযোজ্য হবে। রমযানুল মুবারককে দৃশ্যতঃ বন্দীজীবন মনে হবে, এ থেকে বেরিয়ে আসলে মনে হবে জাগতিক লোকেরা বিভিন্ন রকম ভোগ-বিলাসে নিমজ্জিত। পার্কে ও গলিসমূহে নোংরামী দেখবে। যেদিক দিয়ে যাবেন চোখ ফেরানো কষ্টকর হবে। অথচ আপনি খোদাতাআলার উদ্দেশ্যে কারাবরণ করে থাকবেন। এটি সেই কারা যা বস্তুতঃ জান্নাত। যে জান্নাত এরা বানিয়েছে তা জাহান্নাম। এ বিষয়টিকে সব সময় সামনে রাখতে হবে তাহলে আপনার রমযান অপেক্ষাকৃত সহজ এবং আরামের সঙ্গে কাটবে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এখানে অত্যন্ত মনোরম শব্দে তাকওয়ার উপদেশ দিয়েছেন। তাকওয়া নামাযের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি করে। উভয়ের মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, তাকওয়া নামাযের প্রাণ সঞ্চার করে। আর নামায তাকওয়ার প্রাণ সঞ্চার করে। তিনি (আঃ) বলেন, "কাল (অর্থাৎ ২২ শে জুন, ১৮৯৯) অনেকবার খোদাতাআলার পক্ষ থেকে ইলহাম হয়েছে যে, তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও। এবং তাকওয়ার রাস্তাসমূহে ধাবিত হও। তাহলে খোদাতাআলা তোমাদের সঙ্গী হবেন।" ২২শে জুন ১৮৯৯ তারিখে পুনঃ পুনঃ এই ইলহাম হয়। এ শতাব্দীও শেষ হওয়ার আর অল্প সময়ই রয়েছে। আগামী শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্বে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উপর এই ইলহাম পুনঃ পুনঃ হয়। যার অর্থ হচ্ছে এটি যেন আগামী শতাব্দীর প্রবেশদ্বার হয়ে যায়। **আগামী শতাব্দীতে প্রবেশের জন্য পৃথিবীতেও অনেক প্রবেশদ্বার সাজানো হবে যার ভেতর দিয়ে তারা আগামী শতাব্দীতে প্রবেশ করবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-কে এই প্রবেশদ্বার দান করা হয় ইলহামের মাধ্যমে যা তাকওয়ার প্রবেশদ্বার।** জুন ১৮৯৯ এর ইলহাম নিঃসন্দেহে আমাদের জন্যও প্রযোজ্য যা আমাদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাচ্ছে। আগামী শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্বে আমাদের এদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। তিনি (আঃ) বলছেন, "তোমরা মুত্তাকী হয়ে যাও"–ইলহামটি পুনঃ পুনঃ হয়েছে এবং তাকওয়ার সূক্ষ্ম রাস্তাসমূহে যাত্রা কর তাহলে খোদাতাআলা তোমাদের সঙ্গী হবেন। খোদাতাআলার শতাব্দী এবং খোদাতাআলার পৃথিবী তাদেরই হবে যাদের সঙ্গে খোদাতাআলা আছেন। আগামী শতাব্দীতে প্রবেশের পূর্বে আমরা যদি দৃঢ়-সংকল্প নিয়ে এই ইলহামকে গ্রহণ করি এবং বিশ্বাসের সঙ্গে প্রবেশ করি যে, খোদাতাআলা আমাদের সঙ্গে আছেন তাহলে সারা শতাব্দী ও সমস্ত পৃথিবী আমাদের হবে। এরপর হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেছেন, "এ থেকে আমার হৃদয়ে বড় ব্যথার সৃষ্টি হয়। এই ইলহামের সঙ্গে হৃদয়ে বড় ব্যথার সৃষ্টি হয়, আমি কি করব যাতে আমাদের জামাত প্রকৃত তাকওয়া এবং পবিত্রতা অবলম্বন করে।" এ ছিল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর হৃদয়ের অবস্থা। আপনাদের জন্য যারা এ সময় আগামী শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর (হৃদয়ের) যে অবস্থা ছিল এখনও সে অবস্থাই আছে। এখনও এই ইলহামের অনুবর্তিতায় হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর ব্যথিত হৃদয়ের দোয়া আমাদের কাছে পৌঁছাচ্ছে। অতপর তিনি (আঃ) বলেন, "আমি এত দোয়া করি যে, দোয়া করতে করতে দুর্বলতার আধিক্য ছেয়ে যায়। কখনও কখনও এমন হয় যে, সংজ্ঞাহীন এবং মৃত্যুর অবস্থা সৃষ্টি হয়।" **তাকওয়ার অর্থ সহজ নয়। তাকওয়া লাভের মধ্যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর দোয়া শামিল রয়েছে, যা পৃথিবীকে তাকওয়া দেওয়ার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলো। যাকে খোদাতাআলা (পৃথিবীর) ইমাম বানিয়েছিলেন।** এই ছিল তাঁর হৃদয়ের অবস্থা। প্রকৃতপক্ষে আমি এখন জামাতে যে, বিরাট সংখ্যায় তাকওয়ার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার অবস্থা দেখছি এতে আমার হৃদয়ে বিন্দু পরিমাণ ধারণা নেই যে, কোন কিছু আমার জন্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগ, প্রত্যেক শতাব্দীই তাঁর, প্রত্যেক শতাব্দীর মাথায় দাঁড়িয়ে তিনিই (আঃ) বলছেন। আপনার ভাষার শক্তি খোদাতাআলা থেকে শক্তি সঞ্চার করে যাতে আগামী শতাব্দী কল্যাণময় হয়। এবং তাতে পুণ্যের ঢেউ বইতে আরম্ভ করে।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর শব্দে, তাঁরই (আঃ) দোয়ার সঙ্গে আমি আপনাদের ঐ উদ্ধৃতি পড়ে শুনাচ্ছি যে, "তিনি (আঃ) কি চান?" যতক্ষণ পর্যন্ত কোন জামাত খোদাতাআলার দৃষ্টিতে মুত্তাকী না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত খোদাতাআলার সাহায্য তার সঙ্গী হতে পারবে না।" আমি যে উদ্ধৃতি পড়ে শুনাচ্ছি তা হযরত মৌলভী আবদুল করীম (রাঃ)-এর একটি পত্র থেকে নেয়া হয়েছে। ২৩ শে জুন, ১৮৯৯ ইং ইহা তারিখে তিনি লিখেছেন এবং

'ডে-নাইট'-এর মিথ্যাচার !

– সাহেবুল কাহ্‌ফ

সাপ্তাহিক 'ডে-নাইট' পত্রিকা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের বিভিন্ন বিষয়াদিকে প্রেক্ষাপটে রেখে ২৯শে ডিসেম্বর '৯৭ একটি সংখ্যা প্রকাশ করেছে। এতে আমাদের জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা এবং তাঁর খলীফাগণের ছবি সহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের— যেমন বিশ্বের বিভিন্নস্থানে প্রতিষ্ঠিত কতিপয় মসজিদ, বিভিন্ন ভাষায় কুরআন শরীফের প্রকাশনা এম, টি, এর প্রচারণা ইত্যাদি, – ভিত্তিতে সুদৃশ্য ছবি ছাপা হয়েছে। এটাকে কাদিয়ানী সংখ্যা বল্লেও বেশী বলা হবে না। এ সংখ্যার জন্যে আমরা 'ডে-নাইট'কে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। সাথে সাথে প্রবন্ধাদিতে হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত জামাত সম্বন্ধে যে মিথ্যাচারের অবতারণা করা হয়েছে তারও তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং 'ডে-নাইট'কে জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ)-প্রদত্ত শর্তাবলী অনুযায়ী মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করার আহ্‌বান জানাচ্ছি। যদি 'ডে-নাইট'' নিজ পত্রিকায় ঘোষণা দিয়ে মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে তাহলে আমাদের বিশ্বাস ১ (এক) বছরের মধ্যে আহমদী জামাতের সত্যতা সম্বন্ধে তারা অবহিত হতে পারবে এবং নিদর্শন দেখতে পারবে।

'ডে-নাইট' পত্রিকার প্রবন্ধাদিতে যেসব অভিযোগ, আপত্তি ও মিথ্যাচারের অবতারণা করা হয়েছে তা নতুন কিছু নয়। এগুলো তাদের গুরুজনেরা আগেই করে রেখেছেন এবং এগুলোর জবাবও যথাসময়ে আমাদের পুস্তক-পুস্তিকাতে এন্তার দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ প্রসঙ্গে আর কথা বাড়াতে চাই না।

তবে, জনৈক আহাম্মদ আনোয়ার মুরাদ প্রণীত 'কাদিয়ানীদের কুহেলিকা' নিবন্ধটির কয়েকটি দিকে আলোকপাত করতে চাই ঃ

(১) আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই যে, আহমদী জামাত কথায়, কাজে বা ইঙ্গিতেও কখনও নবী করীম (সাঃ), ইসলাম ও প্রকৃত মুসলমানদের ওপরে হামলা, কটূক্তি বা দজ্জোক্তি করেনি বা করছে না। এ ব্যাপারে যদি কোন ব্যক্তি বা সংগঠন আমাদের ওপরে অহেতুক দোষারোপ করে তাহলে আমরা শুধু উচ্চরণ করবো – লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।

(২) নবী করীম (সাঃ) ও ইসলামের কলেমা ব্যতিরেকে অন্য কোন নবী বা ধর্মের কোন কলেমা আছে বলে যদি তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাদিও ইতিহাস থেকে বা তারা এখনও এ কলেমা পাঠ করেন বলে যথাযথ প্রমাণ পেশ করতে পারেন তাহলে এ জমাতের পক্ষ থেকে নিবন্ধকারকে পুরস্কৃত করার ঘোষণা করছি।

(৩) জনাব মুরাদ সাহেব আহমদীদের কবর দেয়া প্রসঙ্গে প্রশ্ন ও আপত্তি তুলেছেন। কবরের স্থান লাভ করা আহমদীদের পৌর ও নাগরিক অধিকার। যদি এটা দিতে কারও আপত্তি থাকে তো না দিক। এতে তিনি আল্লাহ্‌র নিকটে ও মানবতার নিকটে অধিকার হননের অপরাধে অপরাধী হবেন। আহমদীদের কাছে মৃতব্যক্তির আত্মার মূল্যই অধিক। লাশের তেমন কোন মূল্য নেই। সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্বে মদমত্ত হয়ে যদি আপনারা লাশ দাফন করার ব্যবস্থা না করে দেন, যদিও এ ব্যাপারে আপনাদের ধর্মীয় ও আইনতঃ কোন অধিকার নেই, তাহলে ইহা আপনাদেরই ক্ষতি সাধন করবে। আপনাদের পরিবেশই নষ্ট করবে। মৃত ব্যক্তির এতে কিছু যাবে আসবে না।

(৪) আহমদী জামাত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। আহমদীরা যে রাষ্ট্রেরই নাগরিক হোন না কেন তারা সর্বদা ঐ দেশ বা সরকারের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থাকেন। ইহা ইসলামেরই শিক্ষা। দুনিয়ার কোন সরকার বা অন্য কেউ আজ অব্দি আহমদীদের মধ্যে এর ব্যতিক্রম আচরণ দেখাতে পারে নি আর ইনশাআল্লাহ্‌ কখনও পারবে না। দেশ-প্রেম ঈমানের অঙ্গ। নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, – হুব্বুল ওয়াতানে মিনাল ঈমান অর্থাৎ দেশ-প্রেম ঈমানের অঙ্গ। দেশে দেশে শত্রুতার এ যুগে আহমদীরা সব দেশেই নাগরিক হিসেবে আছে এমনকি তাদের দেশ রক্ষায়ও অবদান রাখতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা মনে করি এক দেশের আহমদী সৈন্যের গুলিতে অপর দেশের আহমদী সৈন্য যদি মারা যায় তাহলে সে শহীদ হবে আবার যদি ঐ দেশের আহমদী সৈন্যের গুলিতে প্রথমোক্ত দেশের আহমদী সৈন্য মারা যায় তাহলে সে-ও শহীদ হবে। মোট কথা প্রত্যেক আহমদীকে স্ব স্ব দেশের প্রতি পরিপূর্ণভাবে অনুগতশীল থাকতে হবে। এ শিক্ষা ও নীতি আহমদীরা পুরোপুরি পালন করে যাচ্ছে – বৃটিশ আমলেও, পাকিস্তান আমলেও এবং এখনও।

জনাব মুরাদ সাহেব তার নিবন্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপটকে সামনে এনে একটু সুড়সুড়ি দেয়ার চেষ্টা করেছেন যেন আহমদীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা যুদ্ধ-বিরোধী অপবাদ লাগানো যায়, যেন উদোর পিন্ডি বুধোর ঘারে চাপনো যায়। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আহমদীদের ভূমিকা কি ছিলো তা বর্তমান সরকারের শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ভালই অবহিত আছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে পানি ঘোলা করার চেষ্টা করলে তা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে হয় না। বিভিন্নভাবে আহমদী জামাত দেশের তথা দশের খেদমত করে যাচ্ছে। মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়ার (MTA) কথা আপনিও লিখেছেন। ইহা সারা দুনিয়াতে একই সময় মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা বাদেও জাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সম্বলিত এক ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠান প্রচার করে যাচ্ছে। অন্য কোন সংগঠন আজ পর্যন্ত এত বড় সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করছে বলে আমাদের জানা নেই। এ সেবাকে আপনি কি দৃষ্টিতে অবলোকন করবেন ?

(৫) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যখন নবী-রসূল বা প্রত্যাদিষ্ট পুরুষগণ এ পৃথিবীতে আসেন তখন সব লোকই খারাপ হয়ে থাকে না। কিছু ভাল লোকও থাকে। অধিকাংশই খারাপ হয়ে থাকে। আবার কোন কোন নবী-রসূল বিশেষ বিশেষ কাজেও আবির্ভূত হন। তাঁরা এসে সংশোধনের একটি প্রক্রিয়া চালু করেন, ফলে পুনরায় অধিকাংশ লোক ভাল হয়ে যায়। আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা এসেও আল্লাহ্‌ ও নবী করীম (সাঃ)-এর নির্দেশে একটি আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া চালু করেছেন যদ্বারা অধিকাংশ লোক নৈতিক ও আধ্যাত্মিকভাবে উন্নতি লাভ করেছে ও করছে। এ কথা কেউ দাবী করতে পারবে না যে, কোন নবীর যুগে শতকরা একশ'জনই এবং একশ ভাগই ভাল হয়ে গেছে। নবী করীম (সাঃ)-এর সময়ের কথাই ধরুন না কেন। তখন কি মুনাফেক ছিলো না। খারাপ লোক তখনও ছিলো। অন্য নবীদের সময়ও ছিলো। ধর্মের ইতিহাস পাঠ করলে এর সত্যতা প্রতিভাত হবে।

জনাব মুরাদ সাহেব কতকগুলো ব্যক্তিগত পর্যায়ের বিষয়াদির কথা উল্লেখ করে আহমদীয়া জামাতের বদনাম করার চেষ্টা করেছেন— কাঁচা ফল ও পচা ফল দ্বারা ফলের বিচার করতে চেয়েছেন। এতে তার হৃদয়ের দৈন্য দশাই প্রকাশ পেয়েছে বল্লে অত্যুক্তি করা হবে না। আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি যে, আহমদীয়া জামাতের অধিকাংশ খাঁটি মুসলমান এবং এর ভুরি ভুরি প্রমাণ আহমদী জামাতের বিরুদ্ধবাদীদের লেখায় বক্তৃতায়ও পাওয়া যাবে। তাকে দয়া করে সেগুলো পাঠ করতে অনুরোধ করছি।

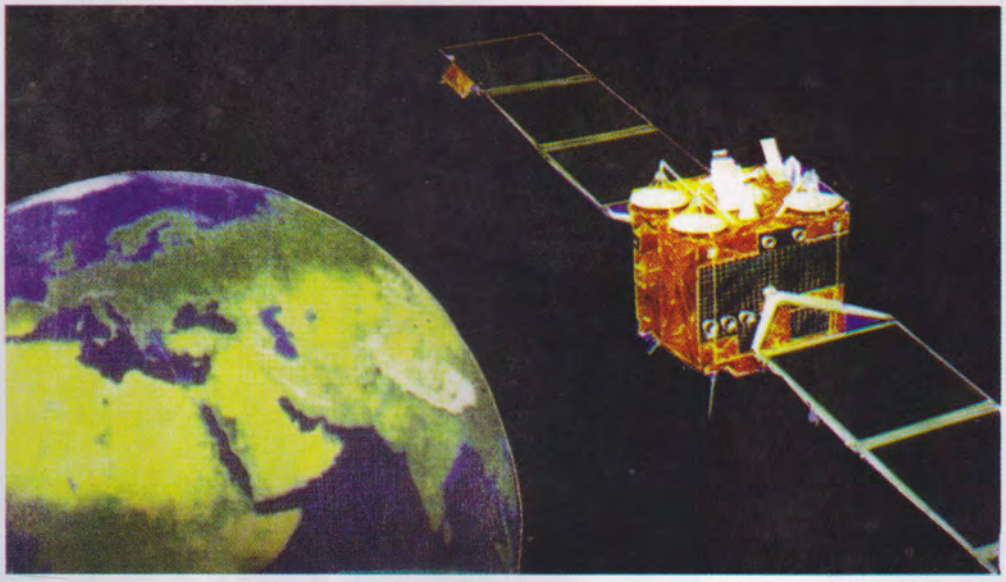

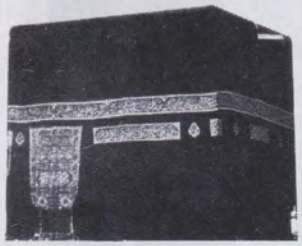

Muslim TV
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

এমটিএ অহোরাত্র
দর্শক যার বিশ্বে সর্বত্র

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ MTA একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।
- প্রতিদিন হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এঁর সহিত প্রশ্নোত্তর নেশন 'ঝিকামাম্বল আরবম্ব দেখুন।
- প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭ টায় হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর খুৎবাহ শুনুন।

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

এমটিএ MTA: ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

৪ বক্‌শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

13th Issue 15th January, 1998
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

QUALITY IS OUR TRADITION

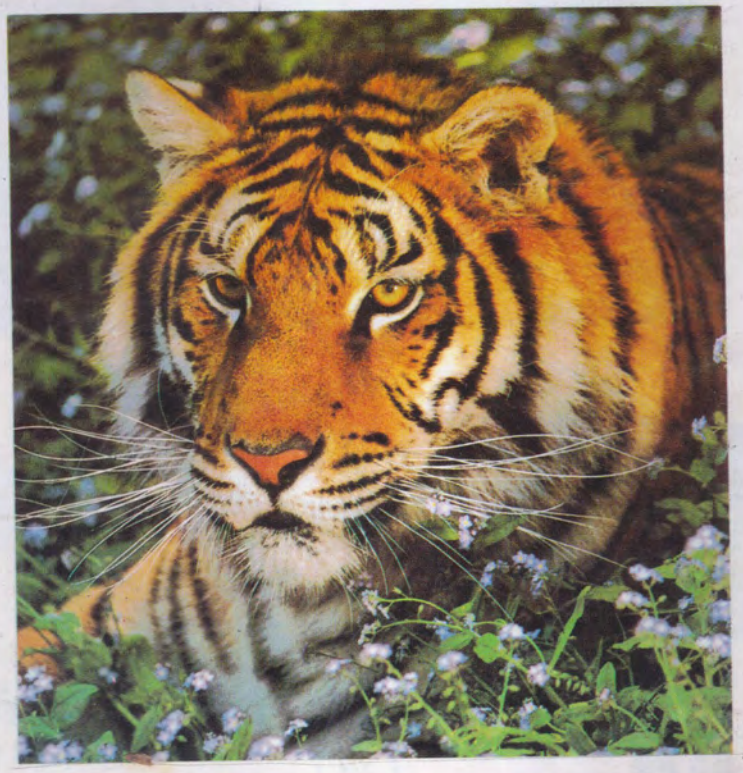

AMECON
এমিকন

HEAD OFFICE : H-79/3, BLOCK-E, BANANI CHAIRMAN BARI, DHAKA-1213, BANGLADESH, TELEFAX : 880-2-884945, TEL : 605331

BRANCH OFFICE : 205, BAIZID BOSTAMI ROAD, BAIZID BOSTAMI , CHITTAGONG. PHONE : 682216

SPECIALIST IN ADVERTISING, DESIGN, PRINTING HOARDING, DECORATION, PLASTIC & METAL SIGN ARMY CRESTS, WOODEN & STEEL, FABRICATION WORK, SCULPTURE & MODELING.

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্‌মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১
থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272